ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে

একবিংশ শতাব্দীর গণতন্ত্র

(সূরা আসরের আলোকে)

মাওলানা আসেম উমর হাফিজাহুল্লাহ



মীর আবদুল্লাহ অনূদিত

ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে

একবিংশ শতাব্দীর গণতন্ত্র

(সূরা আসরের আলোকে)

মূলঃ মাওলানা আসেম উমর হাফিজাহুল্লাহ

অনুবাদঃ মীর আবদুল্লাহ

AN-NASR

ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে

একবিংশ শতাব্দীর গণতন্ত্র

আন- নাসর কর্তৃক প্রকাশিত

প্রকাশকালঃ শাওয়াল ১৪৪০ হিজরি / আগস্ট ২০১৯ ইসায়ী

মূল্য :০.০০ টাকা মাত্র

সূচিপত্র

অর্পণ

তাঁদের প্রতি; যাঁরা বিশ্বাস করেন, ইসলামই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা।

ইসলামের বিধিবিধান পালনের মাঝেই ইহকাল ও পরকালের প্রকৃত সফলতা।

ভূমিকা

সূরা আসর - কুরআনে কারীমের ছোট এ সূরা মানবজাতিকে অলসতা থেকে জাগিয়ে তোলার জন্য যথেষ্ট। শুধু দরকার শোনার মতো কানের, বুঝার মতো হৃদয়ের, লাভ-লোকসান চিহ্নিত করতে সক্ষম বিবেকের এবং মনোবৃত্তির আস্তরণ পড়েনি এমন চোখের।

এ সূরা প্রত্যেক মানুষকে আলাদাভাবে আলস্য ছেড়ে জেগে ওঠার আহ্বান জানাচ্ছে। আবার সামাজিকভাবে প্রত্যেককে এমন এক কর্মপদ্ধতি শিখিয়ে দিচ্ছে, যা অনুসরণ করে যে কেউ মৌলিক চরিত্রাবলি ও উন্নত মননের অধিকারী হতে পারে।

এ সূরা মানবজাতিকে এমন নীতি শিক্ষা দিচ্ছে, যাকে সম্বল করে অনগ্রসর ও অনুন্নত জাতিগোষ্ঠীও মর্যাদা ও উন্নতির পথে হাঁটতে পারে। পক্ষান্তরে যা ছেড়ে দেওয়ার ফলে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছা জাতিও অধঃপতনে পতিত হওয়া থেকে বাঁচতে পারে না।

এ সূরা দুর্বলদেরকে সত্য বলতে সাহস যোগায় এবং সেই সত্যের জন্য নিজের সবকিছুকে বিসর্জন দিতে প্রেরণা যোগায়।

এ সূরা মুসলমানদের মাঝে ঈমান-অবিচলতার মশাল জ্বালায়। তাদেরকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করে সর্বদা আমলের জন্য উৎসাহিত করে। আর দুর্বল-অক্ষম মুসলমানদের মাঝে জাগায় আমলের অনুপ্রেরণা।

এ সূরা দুর্বলদের অবিরাম প্রচেষ্টা ও অবদান রাখার প্রতি উৎসাহিত করে বলে, তোমরাই পারবে লাঞ্ছনার অতল গহ্বরে তলিয়ে যাওয়া মানবতাকে মর্যাদা ও সম্মানের মহাসড়কে তুলে

আনতে। ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়ানো পৃথিবীকে সফলতার মুখ দেখাতে। তোমরাই পারবে মানুষকে শয়তানের ভাগাড় থেকে উদ্ধার করে রহমানুর রহীমের জান্নাতে পৌঁছে দিতে।

এ সূরা মুসলিম উম্মাহকে وتواصوا بالحق তথা 'পরস্পরকে সৎকর্মের তাগিদ' এবং وتواصوا بالصبر তথা 'পরস্পরকে ধৈর্যধারণের তাগিদ' এর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ভবিষ্যতে মানবতার নেতৃত্ব ও মানবসমাজকে নিজেদের মতো করে রাঙানোর রহস্য বর্ণনা করছে।

এ সূরার প্রত্যেকটি বাক্যকে অন্তরের কানে শোনো। কী বিশ্বাস ও আস্থায় তা পরিপূর্ণ! শত দুর্বলতা সত্ত্বেও এটি তার বিপরীত সব সভ্যতা-সংস্কৃতিকে চ্যালেঞ্জ করে ঘোষণা করছে- বাহ্যিক সাফল্যপ্রাপ্ত সমস্ত সভ্যতাই ক্ষতিগ্রস্ত এবং চিন্তানৈতিক দৈন্যতার স্বীকার। কিন্তু এ শরীয়াহর দাওয়াত, যা এ উম্মাহ তথা মুহাম্মাদ ﷺ এর প্রেমিকগণ দিয়ে যাচ্ছেন; তা-ই একমাত্র সফলতার গ্যারান্টি দিতে পারে। এ দ্বীন ছাড়া সাফল্য ও মুক্তির কোনো পথ নেই। তাদের (দ্বীনবিরোধীদের) ভাগ্যে রয়েছে শুধু ক্ষতিই ক্ষতি। তাদের প্রত্যেকটি সেকেন্ড, মিনিট ও মুহূর্ত ক্ষতির সম্মুখীন। তাদের জীবনবাজারে চলছে চরম মন্দা।

তাই তো ইমাম রাযী রহ. সূরা আসরের তাফসীরে বলেন, পূর্বসূরিদের কোনো মনীষী বলেছেন, এ সূরার তাফসীর আমি সেই বরফবিক্রেতা থেকে শিখেছি, যে ডাক দিয়ে বলে-

ارحموا من يذوب رأس ماله، ارحموا من يذوب رأس ماله

'সেই ব্যক্তিকে রহম করো, যার মাল গলে যাচ্ছে! সেই ব্যক্তিকে রহম করো, যার মাল গলে যাচ্ছে!'

এ পৃথিবী যেন একটি বাজার। আর তাতে বসবাসকারীরা হচ্ছে ব্যবসায়ী। জীবনের নিশ্বাস-প্রশ্বাসগুলি তাদের পুঁজি। তো কার পুঁজি লাভজনক হচ্ছে আর কে মাথায় হাত রাখছে? কার জীবন সফলতার মুখ দেখছে আর কার জীবন লোকসানে বিপর্যস্ত হচ্ছে?- তা খুব ভালো করেই জানা।

আসুন, এ সূরার মাধ্যমে আমাদের ঈমানকে মজবুত করি; যাতে ফেতনা বর্ষণকালে ঈমান-আমলের ছাতা ধরতে পারি। আসুন, এ সূরার মাধ্যমে নিজেদের বিশ্বাসকে সজীব করে তুলি; যাতে আমরা বিশ্বকুফরের সামনে ইস্পাতকঠিন হয়ে দাঁড়াতে পারি। এই তিন আয়াতে ডুব দিয়ে রিক্ততার অনুভূতিসাগর থেকে বেরিয়ে আসি, যেখানে আজকের যুবসমাজকে দাজ্জালী মিডিয়া ডুবিয়ে রেখেছে।

আসুন, বিশ্বকুফরী শক্তির ভয়ে ভীত হয়ে থরথর কাঁপতে থাকা দেহগুলোতে এ সূরার একটু উষ্ণতা দিই; যাতে তাওহীদের স্লোগান মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে আসে।

আসুন, ইসলামের শত্রুবাহিনী ও সামরিক সংস্থাগুলোর বধ্যভূমিতে এ সূরার ঘোষণা করে দিই যে, মুহাম্মাদ ﷺ এর আনীত শরীয়াহর দাওয়াত ও তার ওপর অবিচল থাকার উপদেশই কুরআনের সম্মান রাখতে পারে।

আসুন, এ সূরা সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করি; যেটি সম্পর্কে ইমাম শাফিঈ রহ. বলেন¬-

لو لم ينزل غير هذه السورة لكفت الناس لأنها شملت جميع علوم القرآن

'যদি কুরআন মাজীদে শুধু এই সূরাই থাকত, তা একাই বিশ্বমানবতার জন্য যথেষ্ট হতো। কারণ, তাতে রয়েছে কুরআনের সব জ্ঞান।'

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾

"কালের কসম! নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে; কিন্তু তাঁরা নয়, যাঁরা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও পরস্পরকে সবরের উপদেশ দেয়"।

﴿ وَالْعَصْرِ ﴾

অনির্দিষ্টভাবে কালের কসম অথবা আসরের সময়ের কসম উদ্দেশ্য। অথবা মুহাম্মাদ ﷺ এর উম্মতের সময়কালের কসম উদ্দেশ্য। কারণ, এ উম্মাহর বয়সের উদাহরণ আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত। যেমন, হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، أنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس

হযরত সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছেন যে,

"নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের তুলনায় তোমাদের জীবনসীমা আসর ও সূর্যাস্তের মধ্যবর্তী সময়ের পরিমাণ।"

এ উম্মাহর কাঁধে অর্পণ করা হয়েছে পাহাড়সম দায়িত্ব; তবে সময় দেওয়া হয়েছে এত অল্প যে, এর মাধ্যমে উম্মাহকে সতর্ক করা হচ্ছে- তোমাদের কাছে সময় খুবই স্বল্প; তাতেও রয়েছে কত তাড়াহুড়া। সবকিছু যেন নিমিষেই ঘটে যায়!

প্রতিটি দিবসের গোধূলি ইঙ্গিত দেয়, ওহে মানব! আলস্যের কাঁথা খুলে ফেলো। কারণ, সূর্য যখন অস্ত যায়, তখন ছায়া সঙ্গ ত্যাগ করার জন্য দীর্ঘ হতে শুরু করে। পাখপাখালি ফিরে যায় আপন আপন নীড়ে।

সুতরাং হে মানব! তোমার যদি সামান্য বিবেক থাকে; তাহলে দেখো, তোমার জীবনসন্ধ্যাও ঘনিয়ে আসছে। তোমার ছায়াও তোমাকে ত্যাগ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তোমাকে এটাও জানানো হয়নি যে, তোমার জীবনসূর্য কখন অস্তমিত হবে। তারপরও তোমার গাফিলতি, অন্তিম গন্তব্যের ব্যাপারে তোমার উদাসীনতা, স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে দাঁড়ানোর ব্যাপারে বেপরোয়াভাব- কতই না নির্বুদ্ধিতা!!

ওয়াল আসর! দিবসের শেষপ্রহর! হে মানুষ! ঐ অস্তায়মান সূর্যের দিকে তাকাও, কয়েক ঘণ্টা আগেও সেটি এমন ছিল; যার প্রখরতার কারণে তার দিকে তাকানো যায়নি। তার আলো ছিল সহ্যসীমার বাহিরে। যার তীব্রতা ও প্রখরতায় দেহে জলতরঙ্গ বয়ে যেত। কিন্তু এ উত্থানের পর তার পতন ও অস্ত যাওয়ার দৃশ্যটিও দেখো। অতএব ওহে ধন-ঐশ্বর্যের নেশায় বিভোর

মানুষ! ওহে যৌবন নিয়ে গর্বিত তরুণ! ওহে তারুণ্যের যাদুতে মাতোয়ারা মুসলিম বোন! সেই উত্থানের পর পতনের দৃশ্যটিও মনে রাখো। স্বীয় প্রতিপালকের সামনে এখনই সিজদাবনত হয়ে অনুভব করো, তিনি ছাড়া কারো স্থায়িত্ব নেই। সবকিছুই ধ্বংস ও নিঃশেষ হয়ে যাবে। জীবনের কয়েকটি বছর নামের যে পুঁজি দিয়ে তোমাদেরকে পাঠানো হয়েছে, এগুলোকে সফল ব্যবসায় বিনীয়োগ করো। অথবা তা পুরোপুরি মালিকের কাছে সোপর্দ করে দাও এবং সেই চুক্তিকে পূর্ণ করো।

وذلك هو الفوز العظيم "আর এটিই মহাসফলতা।" এটিই সফলতার চাবিকাঠি।

﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾

প্রথম আয়াতে সময়ের কসম করার পর কয়েকটি গুরুত্ববাচক শব্দ এনে বুঝানো হচ্ছে যে, মানুষ ক্ষতিতে নিপতিত।

০১. إِنَّ এর মাধ্যমে গুরুত্বপ্রদান। অর্থাৎ এ কথায় কোনো সন্দেহ নেই; তা একেবারে নিশ্চিত কথা।

০২. لَفِي خُسْرٍ অর্থাৎ ক্ষতিতে নিমজ্জিত। ক্ষতিগ্রস্ত বলা হয়নি। বলা হয়েছে, ক্ষতিতে নিমজ্জিত।

এ ক্ষতি মানুষ হিসেবে বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। কেউ দুনিয়া-আখিরাত উভয় জগতেই ক্ষতির সম্মুখীন। যেমন, কুরআনে কারীমের ঘোষণা-

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴾

"মানুষের মধ্যে কেউ কেউ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে জড়িত হয়ে আল্লাহর ইবাদত করে। যদি সে কল্যাণপ্রাপ্ত হয়; তবে ইবাদতের ওপর কায়েম থাকে। আর যদি কোনো পরীক্ষায় পড়ে; তবে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সে ইহকালে ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।"

কেউ আবার শয়তানের ধোঁকায় পড়ে প্রবৃত্তি ও দুনিয়ার বর্ণিল স্বপ্নে বিভোর হয়ে ক্ষতির শিকার হচ্ছে। (যার প্রতি আল্লাহ লা'নত করেছেন, সেই শয়তান বলেছিল...)

﴿ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ﴾

"আর আমি নিশ্চিতভাবে তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, তাদেরকে আশ্বাস দেব; তাদেরকে পশুদের কর্ণ ছেদন করতে আদেশ দেব এবং তাদেরকে আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করতে আদেশ দেব। যে কেউ আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে পতিত হয়।"

কেউ পার্থিব ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার পরিবর্তে ভোগবিলাসের উপকরণ পেয়ে যায়; কিন্তু সে চিরস্থায়ী আখিরাতে পুরোপুরিই ক্ষতিগ্রস্ত।

﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ﴾

"আর যেদিন কাফেরদেরকে জাহান্নামের কাছে উপস্থিত করা হবে, সেদিন বলা হবে- তোমরা তোমাদের সুখ পার্থিব জীবনেই নিঃশেষ করেছ এবং সেগুলো ভোগ করেছ। সুতরাং আজ তোমাদেরকে অপমানকর আযাবের শাস্তি দেওয়া হবে। কারণ, তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করতে এবং তোমরা পাপাচার করতে।"

ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের এটিও একটি প্রকার:

﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا - الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴾

"বলুন, আমি কি তোমাদেরকে সেসব লোকের সংবাদ দেব? যারা কর্মের দিক থেকে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত। তারাই সেসব লোক, যাদের প্রচেষ্টা পার্থিবজীবনে বিভ্রান্ত হয়; অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করছে।"

﴿ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾

সুতরাং মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিপতিত; তবে সেই ক্ষতি থেকে কারা বাঁচতে পারবে, তা এরপর আলোচিত হচ্ছে।

﴿ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾"সেসব লোক ব্যতীত, যাঁরা ঈমান এনেছে।" আল্লাহ তাআলা এ কথা বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এই ক্ষতি থেকে তারাই বাঁচতে পারে, যারা গাইরুল্লাহ'র ইবাদত

ছেড়ে শুধু এক আল্লাহর ইবাদত করে। তাঁর ইবাদতে কাউকে শরীক করে না। যে কালেমা তাঁরা উচ্চারণ করেছে, তার দাবিসমূহ পূর্ণ করে এবং সেই কালেমায় আল্লাহর সাথে তাঁরা যে অঙ্গীকার করেছে; তা জীবনের কোনো পর্যায়ে ভঙ্গ করে না। এমন লোকই সফলকাম।

ঈমান কী?

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকীদা হলো, যে ব্যক্তি কালেমায়ে তাওহীদকে তার সমস্ত শর্তসহ পড়ে এবং এরপর এমন কোনো কথা-কাজে জড়িত হয়নি, যা সেই কালেমা থেকে বের করে দেয়, সে মুসলমান এবং সে নিশ্চয় কোনো একদিন জান্নাতে প্রবেশ করবে। যেমনটি বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

عن أنس بن مالك أن النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم قال: يخرج من النّار من قال لا إله إلاّ الله، وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثمّ يخرج من النّار من قال لا إله إلاّ الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برّةً، ثمّ يخرج من النّار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن من الخير ذرّةً

আনাস ইবনে মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, "ঐ ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হবে (অপরাধের সাজাভোগ করার পর), যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেছে; যদিও তার অন্তরে যব পরিমাণ কল্যাণ থাকে। অতঃপর ঐ ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হবে, যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেছে; যদিও তার অন্তরে গম পরিমাণ কল্যাণ থাকে। অতঃপর ঐ ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হবে, যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেছে; যদিও তার অন্তরে ধুলিকণা পরিমাণ কল্যাণ থাকে।"

মুসলমানের কাছে ঈমানের দাবি

কিন্তু সাথে সাথে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত এ কথায়ও একমত যে, কালেমা তখনই উপকার দেবে, যখন তার শর্তাবলিসহ পড়া হবে এবং এরপর তার দাবিসমূহ পূর্ণ করা হবে। তাই এমন কিছু শর্ত তাতে আছে, যা পূর্ণ করা ব্যতীত মুখে কালেমা পড়া সত্ত্বেও মানুষ কাফের হয়ে যায়। তেমনি এমন কিছু বিষয় আছে, যা বলা বা করার কারণে মানুষ কালেমা পড়া সত্ত্বেও ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায়।

﴿ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾

“তোমাদের মধ্যে কেউ যদি নিজের দ্বীন থেকে ফিরে দাঁড়ায় এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে; তবে দুনিয়া ও আখিরাতে এরূপ লোকদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারাই হলো দোযখবাসী। তাতে তারা চিরকাল বাস করবে।”

আল্লাহর কুরআন কত এমন লোকের ব্যর্থতা ও বিফলতার কথা ঘোষণা করছে, যারা মুখে কালেমা পড়ার দাবিদার। মুনাফিকদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, তারা জাহান্নামের নিচের স্তরে থাকবে। যদি শুধু মুখে কালেমা পড়া পরকালীন মুক্তির জন্য যথেষ্ট হতো, তাহলে মুনাফিকদেরকে কাফেরদের চেয়ে কঠিন আযাব কেন দেওয়া হবে? বুঝা গেল, কিছু শর্তের ভিত্তিতে মুখে কালেমা পড়া আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য।

আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা করে বলেন-

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴾

"আর মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে, যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি; অথচ আদৌ তারা ঈমানদার নয়।"

﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴾

"যখন মুনাফিকরা আপনার কাছে আসে, তখন তারা বলে- আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ জানেন, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।"

মুনাফিকদের এ স্তরটি কাফেরদের চেয়েও মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত। এদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন-

﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴾

"নিঃসন্দেহে মুনাফিকরা রয়েছে দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে। আর তোমরা কখনো তাদের জন্য কোনো সাহায্যকারী পাবে না।"

তেমনি যে ব্যক্তি এ কালেমা পাঠ করার পর এমন কাজ করে বসে, যা ইসলাম থেকে বের করে দেয় আর সেই অবস্থায় যদি সে মারা যায়; তাহলে সেই ব্যক্তিও কঠিন ক্ষতি থেকে বাঁচতে পারবে না। বুঝা গেল, যে ব্যক্তি মুখে কালেমা পাঠ করা সত্ত্বেও এমন কাজ করে, যা তাকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়; তাহলে সেই কালেমা তার কোনো উপকারে আসবে না। চাই সে মুসলমানের মতো নাম রাখুক, নামাজ পড়ুক, হাজ্ব করুক না কেন!

ঈমান সহীহ হওয়ার শর্তাবলির দিকে ইঙ্গিত করে ইমাম শামী রদ্দুল মুখতারে বলেন, সেই ব্যক্তির কাফের হওয়াতে কোনো সন্দেহ নেই, যে ব্যক্তি ইসলামের আবশ্যকীয় বিষয়ের বিরোধিতা করে; যদিও সে কেবলা মানুক এবং পুরো জীবন ইবাদত করুক।

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. ইকফারুল মুলহিদীন গ্রন্থে বলেন, রাসূল ﷺ এর এ হাদীস-

من صلّى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذلك المسلم

“যে ব্যক্তি আমাদের মতো নামাজ পড়ে, আমাদের কেবলা অনুসরণ করে এবং আমাদের জবাইকৃত পশু খায়, সেই মুসলমান।”

আমি এ হাদীসটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলি, এ হাদীসের ব্যাখ্যা হলো- দ্বীন পূর্ণাঙ্গভাবে মানতে হবে। কোনো কুফরী আবশ্যক করে এমন আকীদা, কথা বা কাজে জড়িত না হতে হবে। এর এ অর্থ নয় যে, যে ব্যক্তিই এ তিন কাজ করবে, যত কুফরী আকীদা ও কাজে জড়িত হোক না কেন; সে মুসলমান।

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী রহ. বলেন-

فتوهم طائفة من الصحابة أن مراده أن مجرد هذه الكلمة يعصم الدم حتى توقفوا في قتال من منع الزكاة، حتى بين لهم أبو بكر - ورجع الصحابة إلى قوله: أن المراد: الكلمتان بحقوقهما ولوازمهما، وهو الإتيان ببقية مباني الإسلام

'কতিপয় সাহাবায়ে কেরাম মনে করেন, এর (উল্লিখিত হাদীস) ব্যাখ্যা হলো, শুধু এ কালেমা পড়ে নেওয়া মৃত্যুদণ্ড এড়াতে পারে। এ কারণে, তাঁরা যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ওপর (প্রথমে) দ্বিধাবোধ করলেন। যখন আবু বকর রাযি. তাঁদেরকে (এ হাদীসের উদ্দেশ্য) বর্ণনা করলেন, সাহাবায়ে কেরামগণও তাঁর কথায় একমত পোষণ করলেন। এর ব্যাখ্যা হলো- এগুলো এমন দু'টি বাক্য; যা তার দাবি ও শর্তাবলিসহ প্রযোজ্য। আর তা হলো, ইসলামের অন্যান্য মৌলিক বিষয়সমূহ পালন করা।'

এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হচ্ছে, নবী ﷺ এর ওফাতের পর যখন জাযিরাতুল আরবে ইরতিদাদের ফেতনা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, তখন এসবের মধ্যে অন্যতম ছিল যাকাত অস্বীকারকারীদের দল। তাদের মাঝে এমন মানুষও ছিল, যারা যাকাত অস্বীকার করত না; তবে বলত যে, যাকাত নেওয়া রাসূল ﷺ এরই বৈশিষ্ট্য ছিল। তাই এখন আমরা নিজেরাই যাকাত আদায় করব। আবু বকরকে (জমা) দেব না। এ কারণেই আবু বকর রাযি. তাদের সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দেন।

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ؛ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ

'আবু বকর রাযি. বলেন, আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই সেই ব্যক্তির সাথে যুদ্ধ করব, যে নামাজ ও যাকাতের মাঝে পার্থক্য করে। কেননা, যাকাত সম্পদের হক।' তখন হযরত উমর রাযি. বলেন, যে ব্যক্তি কালেমা পাঠ করেছে, তার জান-মাল নিরাপদ হয়ে গেছে। তখন আবু বকর রাযি. এ হাদীসের দলিল দিয়ে বলেন, সেই হাদীসে আছে, অর্থাৎ তার জান-মাল নিরাপদ থাকবে না, যে কালেমা পড়ার পরও ইসলামের হকসমূহ আদায় করেনি। আর

যাকাত হলো ইসলামের হক। তাই আমি তাদের সাথে ততদিন পর্যন্ত যুদ্ধ করব, যতদিন পর্যন্ত না তারা যাকাত আদায় করবে। এমনকি একটি উটের রশিও যদি তারা না দেয়, যা রাসূলের যুগে দিত; তার জন্যও যুদ্ধ চলবে।

এ কথা শুনে উমর রাযি.ও একমত হলেন। বললেন, আল্লাহর কসম! আল্লাহ আবু বকর রাযি. এর হৃদয়ের দ্বার খুলে দিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. বলতেন, আবু বকরই আমাদেরকে ইরতিদাদ থেকে বাঁচিয়েছেন।

তেমনি এ হাদীসের ব্যাখ্যা করে আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী ফাতহুল বারীতে বলেন-

وقد وردت الأحاديث بذلك زائدا بعضها على بعض ففي حديث أبي هريرة الاقتصار على قول لا إله إلا الله وفي حديثه من وجه آخر عند مسلم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وفي حديث بن عمر ما ذكرت وفي حديث أنس الماضي في أبواب القبلة فإذا صلوا واستقبلوا وأكلوا ذبيحتنا قال الطبري وغيره أما الأول فقاله في حالة قتاله لأهل الأوثان الذين لا يقرون بالتوحيد وأما الثاني فقاله في حالة قتال أهل الكتاب الذين يعترفون بالتوحيد ويجحدون نبوته عموما أو خصوصا وأما الثالث ففيه الإشارة إلى أن من دخل في الإسلام وشهد بالتوحيد وبالنبوة ولم يعمل بالطاعات أن حكمهم أن يقاتلوا حتى يذعنوا إلى ذلك وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك في أبواب القبلة.

‘উল্লিখিত হাদীস বিভিন্ন শব্দে বর্ধিত হয়ে এসেছে। হযরত আবু হুরাইরার হাদীসে শুধু ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ উল্লেখ আছে। আবার তাঁরই (বর্ণিত) হাদীস সহীহ মুসলিমে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর সাথে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহও উল্লেখ আছে এবং ইবনে উমরের হাদীসে, যা আমি উল্লেখ করেছি। হযরত আনাস রাযি. এর হাদীসে কালেমার সাথে নামাজ, কেবলা ও

জবাইকৃত জন্তুর কথাও উল্লেখ আছে। ইমাম তবারী রহ. বলেন, প্রথম বর্ণনাটি মূর্তিপূজারি মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে এসেছে, যারা তাওহীদকেই অস্বীকার করে। দ্বিতীয় বর্ণনাটি এসেছে আহলে কিতাবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে, যারা তাওহীদের স্বীকারোক্তি তো দেয়; তবে নবী ﷺ এর নবুওয়াতকে অস্বীকার করে। তৃতীয় বর্ণনাটি তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে, যারা ঈমান এনেছে তাওহীদ ও রিসালাতের প্রতি; তবে আল্লাহর দেওয়া ফরযসমূহ পালন করেনি। তাদের ব্যাপারে শরীয়তের নির্দেশ হলো, তাদের বিরুদ্ধে ততদিন পর্যন্ত যুদ্ধ করতে হবে, যতদিন না তারা ফরয পালন আরম্ভ করবে।'

মুখে কালেমা পড়ার ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম বিস্তারিত এভাবে বলেছেন, ইমাম তহাবী রহ. 'শারহু মাআনিল আসার' এ বলেন-

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ أَنَّ يَهُودِيًّا قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ نَسْأَلْ هَذَا النَّبِيَّ، فَقَالَ لَهُ الْآخَرُ: لَا تَقُلْ لَهُ نَبِيٌّ، فَإِنَّهُ إِنْ سَمِعَهَا صَارَتْ لَهُ أَرْبَعَةُ أَعْيُنٍ، فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ﴾ [الإسراء: ١٠١] فَقَالَ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَسْحَرُوا، وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا، وَلَا تَمْشُوا بِبَرِيءٍ إِلَى سُلْطَانٍ لِيَقْتُلَهُ، وَلَا تَقْذِفُوا الْمُحْصَنَةَ، وَلَا تَفِرُّوا مِنَ الزَّحْفِ، وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةَ الْيَهُودِ، أَنْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ قَالَ: فَقَبَّلُوا يَدَهُ، وَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ، قَالَ فَمَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تَتْبَعُونِي؟ قَالُوا: إِنَّ دَاوُدَ دَعَا أَنْ لَا يَزَالَ فِي ذُرِّيَّتِهِ نَبِيٌّ، وَإِنَّا نَخْشَى إِنِ اتَّبَعْنَاكَ، أَنْ تَقْتُلَنَا الْيَهُودُ "قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْيَهُودَ قَدْ كَانُوا أَقَرُّوا بِنُبُوَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ تَوْحِيدِهِمْ لِلَّهِ، فَلَمْ يُقَاتِلْهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يُقِرُّوا بِجَمِيعِ مَا يُقِرُّ بِهِ الْمُسْلِمُونَ، فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا بِذَلِكَ الْقَوْلِ

مُسْلِمِينَ، وَثَبَتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالْمَعَانِي الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ، وَتَرْكِ سَائِرِ الْمِلَلِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.

'হযরত সফওয়ান ইবনে আসসাল থেকে বর্ণিত, এক ইয়াহুদী তার বন্ধুকে বলল, এস! এই নবী থেকে কিছু প্রশ্ন করি। দ্বিতীয়জন বলল, নবী বলো না। তিনি শুনে ফেললে আবার খুশিতে বাগবাগ হয়ে যাবেন। তখন তারা দু'জন নবী কারীম ﷺ এর কাছে এল। কুরআনের আয়াত 'আমি মূসাকে নয়টি প্রকাশ্য নিদর্শন দান করেছি' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। নবী কারীম ﷺ এর উত্তরে বললেন, নয়টি নিদর্শন হলো এই- আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না, আল্লাহ তাআলা যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন তাকে হত্যা করো না; তবে কোনো দণ্ডবিধির কারণে হত্যা করা যাবে, চুরি করো না, ব্যভিচার করো না, জাদু করো না, সুদ খেয়ো না, কোনো নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে বিচারকের কাছে যেও না, সতী-সাধ্বী নারীদেরকে অপবাদ দিও না, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চলাকালীন পালিয়ে যেও না, ইয়াহুদীদের জন্য আলাদা হুকুম হলো, তারা শনিবারে অবাধ্যতা থেকে মুক্ত থাকবে। তখন সেই দুই ইয়াহুদী রাসূল ﷺ এর হাতে চুমো খেল এবং বলল, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহর নবী। রাসূল ﷺ বললেন, তারপরও কেন তোমরা আমার অনুসরণ করছ না? তারা বলল, দাউদ আ. আল্লাহর কাছে দুআ করেছিলেন, তাঁর সন্তান-সন্ততিতে সব সময় নবী থাকবে। সুতরাং আমাদের আশংকা হয়, আমরা আপনার অনুসরণ করলে ইয়াহুদীরা আমাদের হত্যা করে ফেলবে।'

ইমাম তহাবী রহ. বলেন, এ হাদীসের মধ্যে ইয়াহুদীরা আল্লাহর তাওহীদের স্বীকারোক্তি দেওয়ার সাথে সাথে নবী কারীম ﷺ এর নবুওয়াতকেও স্বীকার করে নিয়েছিল। তারপরও তিনি তাদের সাথে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকতে বলেননি, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা অন্যান্য মুসলমানের মতো সেই বিষয়াবলি মেনে নেয়; যা মানা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যক।'

সুতরাং বুঝা যায়, ইয়াহুদীরা সেই স্বীকারোক্তির মাধ্যমে মুসলমান হয়ে যায়নি। এ কথাও প্রমাণিত হলো যে, সেসব বিষয় ছাড়া ইসলাম গ্রহণযোগ্য নয়, যা ইসলামে প্রবেশের ওপর বুঝায়। আর সব ধর্ম ত্যাগ না করলে ইসলামে প্রবেশ করা যায় না।

এ ব্যাপারে ইমাম তহাবী রহ. আরও বলেন-

حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: ثنا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا آيَةُ الْإِسْلَامِ؟ قَالَ أَنْ تَقُولَ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ، وَتَخَلَّيْتُ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ فَلَمَّا كَانَ جَوَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ، لَمَّا سُئِلَ عَنْ آيَةِ الْإِسْلَامِ أَنْ تَقُولَ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ، وَتَخَلَّيْتُ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ وَكَانَ التَّخَلِّي هُوَ تَرْكُ كُلِّ الْأَدْيَانِ إِلَى اللهِ ثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَنْ لَمْ يَتَخَلَّ مِمَّا سِوَى الْإِسْلَامِ، لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ دُخُولَهُ فِي الْإِسْلَامِ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ.

'বাহায ইবনে হাকীম তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ﷺ)! ইসলামের নিদর্শনাবলি কী কী? তিনি বললেন, তোমরা বলো, আমি নিজের চেহারা আল্লাহর সামনে ঝুঁকিয়ে দিয়েছি। সব ধর্মকে পরিত্যাগ করেছি। তোমরা

নামাজ পড়ো। যাকাত দাও। আর মুশরিকদের সাথে বসবাস ছেড়ে মুসলমানদের কাছে চলে এসো।

ইমাম তহাবী রহ. বলেন, تخلي অর্থ সব ধর্ম ছেড়ে দেওয়া। এর দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত বাকি সব দ্বীন পরিত্যাগ করবে না, সে ইসলামে প্রবেশ করেছে বলে ধর্তব্য হবে না। এটি ইমাম আবু হানিফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রহ. এর মতামত।'

বিস্তারিত আলোচনায় এ কথা প্রতিভাত হয় যে, কালেমার কিছু দাবি আছে, যা পূর্ণ করা ব্যতীত এ কালেমার প্রতি বিশ্বাস গ্রহণযোগ্য হবে না।

ইলাহের সংজ্ঞা

এখানে কালেমায়ে তায়্যিবার অর্থ সংক্ষেপে আলোচনা করা সমীচীন মনে করছি। ইমাম রাগেব ইস্পাহানী বলেন-

وإله جعلوه اسما لكل معبود لهم، وكذا اللات، وسمّوا الشمس إِلَاهَة لاتخاذهم إياها معبودا.

'তারা (কাফেররা) তাদের সব প্রভুকে ইলাহ (উপাস্য) নামকরণ করেছে। আর এমনিভাবে লাতকে। সূর্যকেও তারা ইলাহ নামকরণ করেছিল। কারণ, তারা সেটাকেও উপাস্য বানিয়ে নিয়েছিল। সুতরাং ইলাহ অর্থ এখানে উপাস্য।'

ইমাম ইবনে জারীর তবারী রহ. [مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي] আয়াতের তাফসীরে বলেন-

أي شيء تعبدون "من بعدي"؟ أي من بعد وفاتي؟ قالوا:"نعبد إلهك"، يعني به: قال بنوه له: نعبد معبودك الذي تعبده، ومعبود آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق،"إلها واحدا"

'হযরত ইয়াকুব আ. যখন স্বীয় সন্তানদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা আমার মৃত্যুর পর কার ইবাদত করবে? তখন তাঁরা উত্তর দিল, আমরা আপনার উপাস্য, আপনার পিতা-পিতামহ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক আ. এর উপাস্যের ইবাদত করব। যিনি একমাত্র ইলাহ।'

আল্লামা ইবনে জারীর তবারী রহ.ও এখানে ইলাহের অর্থ উপাস্য করেছেন।

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রহ. স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেন-

أما كفار قريش كانوا يطلقونه في حق الأصنام

'কুরাইশের কাফেররা ইলাহ শব্দটি উপাস্য অর্থে ব্যবহার করত।'

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন-

الإله هو المعبود المطاع فهو إله بمعنى مالوه

'ইলাহ সেই উপাস্য, যার অনুসরণ করা হয়। সুতরাং ইলাহ উপাস্য অর্থেই ব্যবহৃত হয়।'

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেন-

الإله هو الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وخوفا ورجاء وتوكلا

'ইলাহ সেই সত্তা; যার সাথে হৃদয়ের সম্পর্ক থাকে, ভালোবাসা-বড়ত্বের ক্ষেত্রে, আশ্রয় প্রার্থনা ও সম্মানদানের ক্ষেত্রে, ভয় ও আশা-ভরসার ক্ষেত্রে।'

আব্দুল কাদের জিলানী রহ. ইলাহের সংজ্ঞা দেন এভাবে- 'আজ তুমি ভরসা করছ নিজের ওপর, নিজের টাকা-পয়সা, দিনার-দেরহামের ওপর, নিজের কেনাকেটা ও স্বীয় শহরের প্রশাসকের ওপর। যে বস্তুর ওপরই তুমি ভরসা করবে, সেটিই তোমার উপাস্য। যে ব্যক্তিকে তুমি ভয় কর; কিংবা যার কাছে কোনো কিছু আশা কর, সেই তোমার উপাস্য। যে ব্যক্তিকে তুমি লাভ-ক্ষতির মালিক মনে কর, সেই তোমার উপাস্য। সুতরাং অনুধাবন কর, আল্লাহ তাআলাই স্বীয় কুদরতে এসব নিয়ন্ত্রণ করেন। ফলে তিনিই তোমার উপাস্য।'

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু'র চুক্তিই তো এ জন্য যে, আল্লাহ ছাড়া কাউকেই উপাস্যের স্থানে বসানো যাবে না। আর তখনই ঈমান গ্রহণযোগ্য হবে।

উপাসনা কার জন্য?

উল্লিখিত আলোচনায় এ কথা প্রতিভাত হয় যে, ইলাহ অর্থ উপাস্য। অর্থাৎ যার উপাসনা করা হয়। এরপরে সমীচীন মনে হচ্ছে যে, উপাসনার সংজ্ঞা শুরু হোক। কারণ, আমাদের সমাজে উপাসনা বলতে বুঝায়, কেউ কাউকে সিজদা করা বা পূজা করা। অথচ শরীয়াহর ভাষায় তা আরও ব্যাপক।

কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা বলেন-

﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾

“তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পাদ্রী ও ধর্মযাজকদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে এবং মারইয়ামের পুত্র মাসীহকেও; অথচ তাদের প্রতি শুধু এ আদেশ করা হয়েছিল যে, তারা শুধু এক মা’বূদের ইবাদত করবে, যিনি ব্যতীত কোনো সত্য উপাস্য নেই। তিনি তাদের অংশী স্থির করা হতে পবিত্র।”

এ আয়াত সেসব খৃষ্টানদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা আইন রচনা (হারাম, হালাল, বৈধতা-অবৈধতা) এর অধিকার নিজেদের পাদ্রীদেরকে সোপর্দ করেছে। যেটাকে তারা হালাল করে দিতেন, তাদের অনুসারীরাও তাকে হালাল বানিয়ে ফেলত; অথচ আল্লাহ তাআলা তা হারাম করেছিলেন। তেমনি (তাদের) সেই সম্মানিত ও অভিজাতশ্রেণী যা হারাম ঘোষণা করত, মানুষও সেটাকে হারাম বানিয়ে ফেলত; অথচ আল্লাহ তা হালাল করেছিলেন।

এ আয়াতের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে গিয়ে অধিকাংশ মুফাসসির এ ঘটনা বর্ণনা করেন যে, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন আদী ইবনে হাতিম রাযি. যিনি ইতঃপূর্বে খৃষ্টান ছিলেন, রাসূল ﷺ কে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তো তাদেরকে উপাস্য বানাতাম না। রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহ তাআলা যা হালাল করেছেন তারা তা হারাম করত আর তোমরাও তা হারাম মানতে এবং আল্লাহ তাআলা যা হারাম করেছেন তারা তা হালাল করত আর তোমরাও তাকে হালাল ভাবতে। তখন আদী ইবনে হাতিম রাযি. বললেন, হ্যাঁ এমনটিই। তিনি বললেন, এটিই তাদের ইবাদত।

রাসূল ﷺ এ তাফসীরের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, কাউকে আইন রচনার ক্ষমতা দেওয়ার অর্থ হলো, তার উপাসনা করা।

মুফাসসিরগণের ভাষায় উপাসনার অর্থ

মুফাসসিরগণ উপাসনার নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

ইমাম আবু বকর জাসসাস রহ.

ফিকহে হানাফীর সিংহপুরুষ ইমাম আবু বকর জাসসাস রহ. (৩০৫-৩৭০ হি./ ৯১৭-৯৮০ খৃ.) বলেন-

ثم قلدوا أحبارهم هَؤُلَاءِ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ فِي التَّحْلِيلِ وَالتَّحْرِيمِ وَقَبِلُوهُ مِنْهُمْ وَتَرَكُوا أَمْرَ اللَّهِ تَعَالَى فِيمَا حَرَّمَ وَحَلَّلَ صَارُوا مُتَّخِذِينَ لَهُمْ أَرْبَابًا إِذْ نَزَّلُوهُمْ فِي قَبُولِ ذَلِكَ مِنْهُمْ مَنْزِلَةَ الْأَرْبَابِ

অতঃপর তারা (খৃষ্টানরা) হালাল-হারাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিজেদের পাদ্রী-যাজকদের অনুসরণ করতে লাগল। তাদের কাছ থেকে তারা তা গ্রহণ করল। ভুলে গেল আল্লাহর হুকুম, আল্লাহ তাআলা যা হালাল কিংবা হারাম করেছিলেন। তেমনিভাবে খৃষ্টানরা সেসব পাদ্রীকে রব বানিয়ে নিল। কারণ, তারা পাদ্রীদেরকে হুকুম (আইন) গ্রহণ করার ক্ষেত্রে রবের আসনে সমাসীন করেছে।

ইমাম আবু সাউদ রহ.

ইমাম আবু সাউদ রহ. (৮৯৮-৯৮২ হি.) বলেন-

بأن أطاعوهم في تحريم ما أحل الله تعالى وتحليل ما حرمه¬ أربابا من دون الله

তারা নিজেদের উলামা ও পাদ্রীদেরকে রব বানিয়ে নিয়েছিল। এভাবে যে, আল্লাহ যা হালাল ও বৈধ ঘোষণা করেছেন, তা হারাম ও অবৈধ বানানো এবং আল্লাহ যা হারাম ও অবৈধ বলেছেন, তা হালাল ও বৈধ বানানোর ক্ষেত্রে তারা (ইয়াহুদী-খৃষ্টানরা) বড়দের কথা মান্য করত।

একটু পরে তিনি আরও বলেন-

إلا ليعبدوا إلها واحدا عظيم الشأن هو الله سبحانه وتعالى ويطيعوا أمره ولا يطيعوا أمر غيره بخلافه فإن ذلك مخل بعبادته تعالى

তাদেরকে হুকুম দেওয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর হুকুম ও আইনের অনুসরণ করে। এর বিপরীতে অন্য কারো হুকুম ও আইনের অনুসরণ না করে। কারণ, এমনটি করা আল্লাহর ইবাদতের পরিপন্থী ।

আল্লামা আলূসী রহ.

আল্লামা আলূসী রহ. (১২১৭-১২৭০ হি./১৮০২-১৮৫৪ খৃ.) এটিকে ইবাদতেরই বিপরীত বলে দিয়েছেন। তিনি বলেন-

ويطيعوا أمر غيره بخلافه فإن ذلك مناف لعبادته جل شأنه

আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা আল্লাহর হুকুমই মানবে। তিনি ছাড়া অন্য কারো হুকুম মানবে না। কারণ, এমনটি করা আল্লাহর উপাসনার বিপরীত।

ইমাম রাযী রহ.

ইমাম রাযী রহ. (৫৪৪-৬০৬ হি./১০৫০-১২১০ খৃ.) রব বানানোর অর্থটি আরও পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন। যার উদ্দেশ্য মানুষ ভালোভাবে বুঝতে পারবে। তিনি বলেন-

المسألة الثانية: الأكثرون من المفسرين قالوا: ليس المراد من الأرباب أنهم اعتقدوا فيهم أنهم آلهة العالم، بل المراد أنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم

অধিকাংশ মুফাসসিরের মতামত হলো, রব বানানো থেকে এ কথা উদ্দেশ্য নয় যে, তারা নিজেদের পাদ্রীদের ব্যাপারে এ বিশ্বাস রাখতে শুরু করেছে যে, তারাই জগতের উপাস্য। বরং এর উদ্দেশ্য হলো, তারা হুকুম ও আইনকানুনে সেসব পাদ্রীর অনুসরণ করত।

সুতরাং আল্লাহর বিপরীতে আইনকানুন ও হুকুম-আহকামের ক্ষেত্রে কারো অনুসরণ করা মানে তার উপাসনা করা এবং তাকে উপাস্যের স্তরে নিয়ে যাওয়া।

ইমাম আবুল লাইস সমরকন্দী রহ.

ইমাম আবুল লাইস সমরকন্দী রহ. (মৃত্যু: ৩৭৫ হি./ ৯৮৫ খৃ.) বলেন-

أربابا من دون الله، يعني: اتخذوهم كالأرباب يطيعونهم في معاصي الله

অর্থাৎ সেসব ইয়াহুদী-খৃষ্টানরা তাদের বড়দেরকে রবের মতো বানিয়ে ফেলেছে। তারা আল্লাহর অবাধ্যতার ক্ষেত্রে তাদের কথাই মান্য করত।

সুতরাং আল্লাহর অবাধ্যতায় যারা নিজেদের শাসনকর্তা ও নেতাদের হুকুম মান্য করে, তারা মূলত তাদেরকে রব বানিয়ে নিয়েছে।

ইমাম বাগাভী রহ.

একই কথা ইমাম বাগাভী রহ. (মৃত্যু: ৫১৬ হি./১২২২ খৃ.) বলেন-

قلنا: معناه أنهم أطاعوهم في معصية الله واستحلوا ما أحلوا وحرموا ما حرموا، فاتخذوهم كالأرباب

আমরা বলি, এর অর্থ হলো, তারা (খৃষ্টানরা) আল্লাহর অবাধ্যতার ক্ষেত্রে নিজেদের পাদ্রীদের কথা মান্য করেছে। পাদ্রীরা যা হালাল বলেছে, তা হালাল হিসেবে মেনে নিয়েছে আর যা হারাম বলেছে, তা হারাম হিসেবে মেনে নিয়েছে। সুতরাং তারা পাদ্রীদের সাথে রবের ন্যায় আচরণ করেছে।

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.

হযরত থানভী রহ. (মৃত্যু: ৪ জুলাই ১৯৪৩ খৃ.) তাফসীরে বয়ানুল কুরআনে বলেন-

یعنی ان کی اطاعت تحلیل اور تحریم میں مثل طاعت خدا کے کرتے ہیں کہ نص پر ان کے قول کو ترجیح دیتے ہیں اور ایسی اطاعت بالکل عبادت ہے پس اس حساب سے وہ ان کی عبادت کرتے ہیں

অর্থাৎ হালাল-হারাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্যের মতো তাদের অনুসরণ করতে থাকে। নছ (আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশ) এর ওপর তাদের কথাকে প্রাধান্য দেয়। আর এমন অনুসরণ নিরেট উপাসনা। সুতরাং সেই অর্থে তারা তাদের উপাসনা করে।

মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ.

মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. (মৃত্যু: ১০ শাওয়াল ১৩৯৬ হি./৬ অক্টোবর ১৯৭৬ খৃ.) তাফসীরে মাআরিফুল কুরআনে বলেন-

(آگے افعال کفریہ کا بیان ہے کہ) انھوں نے (یعنی یہود و نصاری نے) خدا (کی توحید فی الطاعۃ) کو چھوڑ کر اپنے علماء اور مشائخ کو (باعتبار اطاعت کے) رب بنا رکھا ہے (کہ ان کی اطاعت تحلیل اور تحریم میں مثل اطاعت خدا کے کرتے ہیں کہ نص پر ان کے قول کو ترجیح دیتےہیں اور ایسی اطاعت بالکل عبادت ہیں)

(প্রথমে কুফরী কাজের বর্ণনা) তারা (ইয়াহুদী-খৃষ্টানরা) অনুসরণের ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর অনুসরণ ছেড়ে নিজেদের উলামা-মাশায়েখকে (আনুগত্যের ক্ষেত্রে) রব বানিয়ে নিয়েছে। (তারা যা হালাল-হারাম ঘোষণা করে তা তারা আল্লাহর আনুগত্যের ন্যায় মেনে নেয়। আর তাদের কথাকে আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশের ওপর প্রাধান্য দেয়। এমন আনুগত্য নিরেট উপাসনা।)

মুফতী শফী রহ. এ বিষয়টিকে সুস্পষ্টভাবে ‘উপাসনা’ বলেছেন।

মাওলানা আশেকে এলাহী বুলন্দশহরী রহ.

মাওলানা আশেকে এলাহী বুলন্দশহরী রহ. (১৩৪৩ হি./১৯৯৯ খৃ.) তাফসীরে আনওয়ারুল বয়ানে লিখেন-

"جب تحلیل و تحریم کا اختیار صرف اللہ ہی کو ہے جو خالق اور مالک ہے تو اس کے سوا جو کوئ شخص تحلیل و تحریم کے قانون بنائےاور اپنے پاس سے حلال و حرام قرار دے، اس کی بات ماننا اور فرمانبرداری کرنا اللہ تعالی کے اختیارت میں شریک بنانا ہوا ۔ جیسے اللہ تعالی كي فرمانبرداری کرنا اس کی عبادت ہے، اسی طرح ان امور میں غیر اللہ کی فرمانبرداری کرنا جو اللہ کی شریعت کے خلاف ہیں یہ ان کی عبادت ہے.... چاہے انہیں سجدہ نہ کریں، چونکہ ان جاری کیے ہوئے احکام کے ساتھ اکیسویں صدی میں 'جمہوری نظام' تباہی کے دہا نے پر ! .... إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا فرمانبرداری کا وہی معاملہ ہے اللہ کے احکام کے ساتھ ہونا چاہیے اس لیے ان کی اتباع اور اطاعت کو عبادت قرار دیا "۔

'যেহেতু হালাল-হারাম প্রণয়নের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতেই। যিনি সৃষ্টিকর্তা ও অধিকর্তা। সুতরাং তিনি ব্যতীত যে ব্যক্তিই হালাল-হারাম প্রণয়ন করবে, নিজের পক্ষ থেকে হালাল-হারাম ঘোষণা করবে, তার কথা মান্য করা ও তার আনুগত্য করা মানে আল্লাহর ইচ্ছায় অংশীদার সাব্যস্ত করা। যেমনি আল্লাহর আনুগত্য করা তাঁর উপাসনা। তেমনি সেসব শরীয়াহবিরোধী কাজে গাইরুল্লাহ'র আনুগত্য করাও তাদের উপাসনা; তাদেরকে সিজদা না করলেও। যেহেতু তাদের প্রণীত আইনকানুনের আনুগত্য করার ব্যাপারটি আল্লাহর আদেশের আনুগত্য করার ন্যায়, তাই তাদের আনুগত্যকে উপাসনা বলা হয়েছে।'

ফায়েদা: বর্তমান যুগের মুক্তচিন্তার মানুষেরা যেহেতু ইসলামী অনুশাসন মেনে চলতে কষ্ট অনুভব করে এবং ইসলামের শত্রুদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বলে, উলামায়ে কেরাম সম্মেলন করুক, ইসলামী আইনকানুনের ব্যাপারে চিন্তা-গবেষণা করুক, অমুক অমুক হুকুমটি পাল্টে দিক বা সহজ করে দিক, অমুক অমুক হারাম বিষয়গুলোকে হালাল করে দিক। এসব তাদের অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার ফল। উলামায়ে কেরাম যদি এমন সম্মেলন করে তারা সরাসরি কাফের হয়ে যাবে।

মুফাসসিরগণের তাফসীরের আলোকে এ আয়াত থেকে জানতে পারলাম:

০১. আল্লাহর সাথে কোনো প্রশাসন, প্রতিষ্ঠান বা সরকারকে হালাল-হারাম তথা বৈধতা-অবৈধতাপ্রদান করার ক্ষমতা দেওয়ার অর্থ হলো, আল্লাহকে ছেড়ে সেই প্রশাসন, প্রতিষ্ঠান বা সরকারকে উপাস্য বানিয়ে নেওয়া।

০২. যে ব্যক্তি আল্লাহর হারামকৃত কোনো কাজকে বৈধ (হালাল) ঘোষণা করে, যেমন সুদ ও সুদের কেন্দ্র ব্যাংকগুলোকে বৈধতা দেয়, মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে সাহায্য করে, কুরআনী আইনবিরোধী সিদ্ধান্তদাতা আদালতগুলোকে আইনী রূপ দেয়, এমন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যেন নিজেকেই উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে।

০৩. তারপর যে কেউ সেই অবস্থানকে মেনে নেয়, বা তার আনুগত্য করতে থাকে, তো সে ব্যক্তি যেন তার উপাসক।

০৪. হারাম ও আল্লাহর অবাধ্যতায় কারো আনুগত্য করা, যেমন নিজেদের অফিসারদের নির্দেশে সুদি প্রতিষ্ঠানসমূহ ও গান-বাজনার অনুষ্ঠানে ডিউটি করা, শরীয়াহ বাস্তবায়ন (কথিত সন্ত্রাসবাদ) এর এ যুদ্ধে মুজাহিদীনের বিরুদ্ধে লড়াই করা অথবা অন্য যে কোনোভাবে পুলিশ-সেনাবাহিনীকে সাহায্য করা ইত্যাদি।

০৫. নিজেদের অফিসারবৃন্দ, প্রতিষ্ঠানসমূহ ও পার্লামেন্ট সম্পর্কে এ মনোভাব রাখা যে, তারা যাই হুকুম দেবে, আমাদের জন্য তার আনুগত্য ওয়াজিব। এমন সম্পর্ককে তার 'উপাসনা'ই বলা হবে।

চিন্তার খোরাক

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কি পার্লামেন্টকে এ অধিকার দেওয়া হয়নি? গণতন্ত্রের প্রবক্তারা কি এ কথা দাবি করে না?- আইন প্রণয়নের ক্ষমতা তো পার্লামেন্টের হাতে। তাছাড়া গণতান্ত্রিক সরকারগুলোতে বাস্তবেও কি এমন হচ্ছে না যে, সরকার যেটি ইচ্ছা হালাল করছে, যেটি ইচ্ছা নিষিদ্ধ করছে? তার আনুগত্য করা অবশ্যক করা হচ্ছে, তার বিরোধীদেরকে রাষ্ট্রের চোখে অপরাধী এবং অস্বীকারকারীদেরকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলা হচ্ছে??

পূর্বে হোক বা পশ্চিমে, এটিই গণতন্ত্রের বাস্তবতা। সফলতার গ্যারান্টিদাতা (?) আসল গণতন্ত্রের প্রাণ এটিই। কয়েক ক্লাস পড়েছে আর এই গণতন্ত্রের সংজ্ঞা জানে না এমন কেউ কি আছে? গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার আসল প্রাণ হলো, আইন প্রণয়নের অধিকার নিরঙ্কুশভাবে পার্লামেন্টকে সোপর্দ করা।

এখন যদি কেউ বলে, পার্লামেন্ট তিয়াত্তরের আইন মেনেই চলে, যেখানে আইন প্রণয়নের সর্বোচ্চ ক্ষমতা আল্লাহর জন্য স্বীকার করা হয়েছে। প্রশ্ন হলো, এই যে আইন প্রণয়নের সর্বোচ্চ ক্ষমতা আল্লাহর জন্য- এটি কে মঞ্জুর করেছে? নিশ্চয় সেই পার্লামেন্টই। পৃথিবীতে কি এমন কোনো গণতন্ত্র আছে, যেখানে পার্লামেন্টের সিদ্ধান্ত ছাড়া এ ক্ষমতাটি আল্লাহকে দেওয়া হয়েছে? যারাই গণতন্ত্রের সংজ্ঞা ও এর মূল প্রতিপাদ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, তারা এ প্রশ্নের জবাব ভালোভাবেই জানে। এ ব্যবস্থা যদি এতই ইসলামী হয়, এসব যদি এতই ইসলামী হয়; তো রজম তথা প্রস্তর নিক্ষেপের শরীয়াহ আইনকে আইনে রূপ দেওয়ার জন্য পার্লামেন্টের মঞ্জুরির বাধ্যবাধকতা কেন রাখা হয়েছে? আর সুদকে অবৈধ (হারাম) সাব্যস্ত করার জন্য পার্লামেন্ট নয় শুধু, বরং দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোট কেন লাগবে?

পরিষ্কার কথা হলো, এ ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ আইনপ্রণেতা কে? যিনি মঞ্জুর করেন এবং যাকে মঞ্জুরির যোগ্য মনে করা হয়। মঞ্জুরি পেলে তো ভালো। অন্যথায় রদ করে দিলেও সংবিধানের পবিত্রতায় (গণতন্ত্রপূজারিদের দৃষ্টিতে) কোনো ঘাটতি আসে না। সুতরাং ভাবুন!

এ পার্লামেন্ট নিজের কাজের মাধ্যমে এ কথা বারবার প্রমাণ করছে যে, তার সামনে (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহর হাকিমিয়্যাহ তথা আইন প্রণয়নের ক্ষমতার কী মর্যাদা আছে? যেমন সুদ, বিবাহিত ব্যভিচারীকে প্রস্তর নিক্ষেপ, মুসলমানদের হত্যায় কাফেরদের সাহায্য করা, নির্লজ্জতা ও নাস্তিকতা প্রসারকারী ব্যক্তি ও মাধ্যমগুলোর রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা দান, সুদব্যবস্থাকে রক্ষার জন্য যুদ্ধের অনুমতি প্রদান; বরং এটি ইবাদত মনে করা, শরীয়াহ বাস্তবায়নে লড়াইকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে জিহাদ বলা, ইসলামের অটুট বিধান জিহাদকে অবৈধ

ঘোষণা করা ইত্যাদি। এসব ব্যাপারে পার্লামেন্ট এ কথা প্রমাণ করেছে যে, আইন প্রণয়নের সর্বোচ্চ ক্ষমতা তাদেরই হাতে, আল্লাহর হাতে নয়। (নাউযুবিল্লাহ!)

এত স্পষ্ট কর্মপদ্ধতি হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর দ্বীন, কুরআন ও তাঁর নবীর আনীত শরীয়াহর বিরুদ্ধে (গণতন্ত্রপন্থীরা) এমন দুঃসাহস দেখাচ্ছে যে, প্রত্যেক কুফরীর ওপর ইসলামের লেবেল লাগিয়ে দিয়ে তা গ্রহণ করা হচ্ছে। যদি কোনো কিছু (এ ব্যবস্থায়) গ্রহণ না করা হয়ে থাকে, তবে তা হলো আল্লাহর শরীয়াহ; যেটিকে তিনি সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। এটিকে সম্পূর্ণ আইনকানুন মেনে নেওয়ার পরিবর্তে কথিত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক লড়াই, জাতীয় পর্যায়ের দমন অভিযান, নিরপরাধ মুসলমানদেরকে গণহত্যা, তাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে। আচ্ছা, যদি তোমাদের সংবিধানই ইসলাম হয়, তো কুরআনের আইনকানুনকে পার্লামেন্টের অনুমোদন ছাড়া মেনে নাও না কেন?

আল্লাহর ওয়াস্তে তোমরা দু'দিনের এ তুচ্ছ জীবনের স্বার্থে কুরআন বিক্রয় করো না। আল্লাহর আয়াতসমূহকে তার আসল অর্থ ও তাৎপর্য থেকে সরিয়ে কুরআন-বিকৃতির অপরাধে জড়িত হইও না। সত্যের প্রতি জোর দেওয়ার সাহস যদি তোমার নাও থাকে, বা তোমার কোনো ওজর থাকে; তাহলে অন্তত এতটুকু তো করতে পার যে, মুখটা বন্ধ করে চুপ মেরে থাকবে। হক্কের আজান দিতে পারছ না, তাতে সমর্থন দিতে পারছ না, তাতে সঙ্গ দিতে পারছ না; তো অন্তত কুফরকে ইসলাম প্রমাণ করা থেকে বিরত থাক। পরাশক্তিগুলোর ভয় আর গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর আশঙ্কায় ইসলাম আর কুফরকে তো এক করে ফেলতে পারো না! সিংহভাগ

কুফর আর একটু ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ ইসলাম বলা থেকে বিরত থাক! আমরা জানি, তোমাদের ওপর গোপন সংস্থাগুলোর চাপ ও তোমাদের অপারগতার কথা। এতটুকুতেই থামো! আল্লাহর জন্য থামো! কুফর ও তাকফীরের বিষয়গুলোর মধ্যে কুফর ও ইসলামকে গুলিয়ে ফেলো না। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের প্রসিদ্ধ নীতি হলো, কোনো কথা বা কাজের কুফরী হওয়া এবং তাতে জড়িত ব্যক্তিকে কাফের বলা- দু'টি আলাদা মাসআলা। এ কথায় আমরা শতভাগ একমত যে, কুফরীতে লিপ্ত ব্যক্তিকে কাফের বলার ক্ষেত্রে উলামায়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত যেসব শর্তাবলি আরোপ করেছেন, তা আমাদেরও আকীদা। আল-হামদুলিল্লাহ আমরা আজও সেই আকীদার ওপর অটল আছি। কিন্তু তোমরা তো কুফরকে ইসলাম প্রমাণ করতে চাচ্ছ। কুফরের পক্ষে প্রতিরোধ গড়তেই কুফরের প্রতিবন্ধকতাসমূহের দলিল দিচ্ছ। এখানে একটি পার্থক্য জেনে রাখবে যে, কুফরীতে লিপ্ত কোনো ব্যক্তিকে কাফের বলতে অনেক শর্ত আছে- এ কথার অর্থ এই নয় যে, সেই কুফরী কাজ বা কথাটি ইসলাম হয়ে গিয়েছে। এটি খুব ভালোভাবে বুঝে নাও। তোমরা জেনেশুনেই পুরো আলোচনায় বিষয়টা গুলিয়ে ফেলার চেষ্টা করছ। আল্লাহ তাআলা তা ভালোভাবেই জানেন। তোমরা মানুষকে কুফরী থেকে বাঁচাতে গিয়ে তাদের কুফরীগুলোকেই ইসলাম প্রমাণ করার চেষ্টা করছ। যা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের কারো আকীদা নয়। আল্লাহর সাথে সরাসরি কুফরীকে ইসলাম প্রমাণ করা- এটি খৃষ্টানদের সেই কথা থেকেও মারাত্মক, যা তারা আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে বলেছে।

﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ـ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ـ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ـ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ـ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾

“আর তারা বলে, দয়াময় আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। নিশ্চয় তোমরা তো এক অদ্ভুত কা- করেছ। হয়তো এর কারণে এখনই নভোম-ল ফেটে পড়বে, পৃথিবী খ--বিখ- হবে এবং পর্বতমালা চূর্ণবিচূর্ণ হবে। এ কারণে যে, তারা দয়াময় আল্লাহর জন্য সন্তান আহবান করে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভনীয় নয়।”

সুতরাং একটি সরাসরি কুফরীব্যবস্থা (গণতন্ত্র) কে ইসলামী প্রমাণ করা কত বড় অপরাধ? যদি তোমরা তা বুঝতে পারতে!

কালেমায়ে তাওহীদের দাবি: সব বাতিল জীবনব্যবস্থা (দ্বীন) থেকে পবিত্রতা ঘোষণা

উপাস্য ও উপাসনার সংজ্ঞা জানার পর এটাও জেনে রাখা দরকার যে, একজন ঈমানদারের কাছে কালেমায়ে তাওহীদের প্রথম দাবি হলো, সব বাতিল উপাস্য ও সব বাতিল জীবনব্যবস্থাকে অস্বীকার করা এবং তা থেকে পবিত্রতা ঘোষণা করা। তারপর আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। কালেমার বিন্যাসও এ কথার সমর্থন করে।

لا إله إلا الله محمد رسول الله

কোনো উপাস্য নেই একমাত্র আল্লাহ ছাড়া। মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল।

আল্লাহ তাআলা সূরা বাকারায় বলেন-

﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

“দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি বা বাধ্য-বাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে হিদায়াত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এখন যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল; যা ভাঙবার নয়। আর আল্লাহ সবই শুনেন এবং জানেন।”

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা প্রথমে গাইরুল্লাহ’র অস্বীকৃতি বর্ণনা করেছেন। অতঃপর আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের কথা বলেছেন।

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس على أن يعبد الله ويكفر بما دونه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেন, “ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বিষয়ের ওপর। ০১. একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করা; তিনি ব্যতীত বাকি সবকিছু (মিথ্যা ইলাহকে) অস্বীকার করা, ০২. নামাজ কায়েম করা, ০৩. যাকাত প্রদান করা, ০৪. হাজ্ব করা, ০৫. রমজানের রোজা রাখা।”

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا শুধুমাত্র তারা, যারা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে যে, উপাস্য একমাত্র তিনিই। নামাজেও একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা হবে। ব্যবসায়-বাণিজ্য, সরকার-আদালতেও তিনি ছাড়া অন্য কাউকে উপাস্য বানানো যাবে না। তিনিই বিচারক, তিনিই সৃষ্টিকর্তা।

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ

“জেনে রেখো! সৃষ্টি ও আদেশ দান তাঁরই কাজ।”

তাঁর সৃজনগুণের মধ্যে যেমন কেউ শরীক নেই, তেমনি তাঁর আইন প্রণয়ন ও আদেশগুণেও কেউ শরীক নেই। আইন প্রণয়ন একমাত্র তাঁরই অধিকার। তাতে কাউকে অংশীদার বানানো তাকে উপাস্য বানানোর শামিল; যা সরাসরি কুফরী। কোনটি আইনি, কোনটি বেআইনি? কোনটি বৈধ, কোনটি অবৈধ?- এটি তাঁরই গুণ। এ অধিকার অন্য কারো নেই। তাঁর আদেশ ও আইন পার্লামেন্টে পাশ হওয়া ছাড়াও বাস্তবায়ন করার উপযুক্ত। এ ছাড়া সব আইন বাতিল। সুতরাং তাঁর অবতীর্ণ আইনকানুন এ থেকে পবিত্র যে, সেগুলোকে প্রথমে গণতন্ত্রের দারুন নাদওয়ায় (মক্কার কাফেরদের পার্লামেন্ট, যেখানে বসে তারা আইন প্রণয়ন করত এবং সেই আইনকে ধর্মীয় রূপ দেওয়ার জন্য মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করত) আলোচনা করতে হবে। কুরআনের আইন সংবিধানের অংশ হতে পারবে কিনা - নাউযুবিল্লাহ সেটার জন্য মিটিং করতে হবে?? তা পার্লামেন্ট হয়তো অনুমোদন দেবে, না হয় রদ করে দেবে। আবার চাইলে শাসনযন্ত্রের দেবী পার্লামেন্ট নামের দারুন নাদওয়া সেটি রদ করতেও পারে। আল্লাহর অবতীর্ণ আইন যা মুহাম্মাদ ﷺ কে দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে, নাউযুবিল্লাহ তা পার্লামেন্ট থেকে বের করে দেওয়া হবে?? তারপরও পার্লামেন্ট পবিত্র! সেটির পবিত্রতার শপথ নেওয়া হয়!! সেটির মর্যাদা সম্মানের দোহাই দেওয়া হয়!!

যেন আল্লাহর ইচ্ছাকে পার্লামেন্টের জালিম, বদমাশ, মাদকাসক্ত ও ব্যভিচারীদের হাতে তুলে দেওয়ার নামই গণতন্ত্র। তারা যা ইচ্ছা হালাল (বৈধ) বলবে আর যা ইচ্ছা হারাম (অবৈধ) বলবে।

আল্লাহর কুরআনকে পার্লামেন্টের মুখাপেক্ষী বানানো- এটি তাঁর সত্তার সাথে সুস্পষ্ট কুফরী। তাঁর সাথে এটি ঠাট্টা ও উপহাস। রহমাতুল্লিল আলামীন ﷺ এর আনীত দ্বীনের সাথে এর চেয়ে বড় উপহাস ও অসম্মান আর কী হতে পারে? এর চেয়ে বড় ক্ষতি আর কী হবে?

আল্লাহর অকাট্য আইনকে পার্লামেন্টের অনুমোদনের মুহতাজ বানানোর দৃষ্টিভঙ্গিসহ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কোন ফকীহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে? তবে সেসব ফকীহর কথা ভিন্ন, যারা সামান্য ধন-সম্পদের বিনীময়ে নিজেদের ইলমকে বিক্রয় করেন। অথবা যারা নিজের জীবনযাপনকে স্বাভাবিক গতিতে চলতে দিতে ক্ষমতাবানদের কথা মেনে নিতে বাধ্য।

নবীগণের ইতিহাস এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, তাঁদের সাথে তাঁদের বিরোধীদের মূল দ্বন্দ্ব ছিল- তাঁরা এ কথার দাওয়াত দিতেন যে, জীবনের সকল শাখায় ইবাদত শুধু আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সাথে সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রেও গাইরুল্লাহ'র পরিবর্তে এক আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য করা হবে।

হযরত শুআইব আ. যখন দ্বীনের এ শাখার দাওয়াত দিলেন, তখন ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা বড়ই আশ্চর্য হয়ে বলতে লাগল-

﴿ قَالُوا يَاشُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴾

"তারা বলল, হে শুআইব (আ.)! আপনার নামাজ কি আপনাকে ইহাই শিক্ষা দেয় যে, আমরা ঐসব উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব; আমাদের বাপ-দাদারা যাদের উপাসনা করত? অথবা

আমাদের ধন-সম্পদে ইচ্ছামতো যা কিছু করে থাকি, তা ছেড়ে দেব? আপনি তো একজন খাস মহৎ ব্যক্তি ও সৎপথের পথিক।”

অর্থাৎ তাঁর জাতিও এ বিষয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় ছিল যে, শুআইব আ. এর ধর্ম আমাদের অর্থনীতিব্যবস্থা ও পার্থিব লেনদেন এর মাঝে নাক গলাচ্ছে কেন?

আজকের দিনেও হক্ব-বাতিলের মাঝে এ লড়াই-ই বিদ্যমান। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ এমন ‘পাগলদের’ বিরুদ্ধে পরিচালিত হচ্ছে, যাঁরা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সাথে সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রেও এক আল্লাহর অবতীর্ণ আইন বাস্তবায়নের দাবি জানায়।

দ্বীন ইসলামই গ্রহণযোগ্য; মিশ্র ধর্ম নয়

কিন্তু যাঁরা এক আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছে সেই পূর্ণাঙ্গ শরীয়াহর ওপর, যা মুহাম্মাদ ﷺ এর মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। যিনি আল্লাহর সাথে আধুনিক যুগের কোনো মূর্তিকে উপাস্য বানাননি। যিনি মাসজিদেও এক আল্লাহকে উপাস্য মানতেন। লেনদেন, ব্যবসায়-বাণিজ্য, আইন-আদালত, লাভ-লোকসানেও আল্লাহ ছাড়া সব উপাস্যকে অস্বীকার করতেন। তিনি শুধু আল্লাহর নাযিলকৃত দ্বীনের প্রতিই বিশ্বাস স্থাপন করতেন। ইসলামের সাথে তিনি অন্য কোনো বাদ-মতবাদকে মানতেন না। মিশ্র ধর্মকেও তিনি মানতেন না, যাতে কিছু ইসলাম থেকে নেওয়া হয়েছে, কিছু অন্য ধর্ম থেকে নিয়ে এক নতুন ধর্মের সৃষ্টি করা হয়েছে।

হক্ক-বাতিলের মাঝে চলমান এ লড়াইয়ে বাতিলের পক্ষ থেকে শক্তিপ্রয়োগ করে হক্কের আহ্বানকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়। তাঁদের ওপর সব ধরনের নির্যাতন বৈধ করা হয়। জুলুম-নির্যাতন ও হুমকি-ধমকিতে ব্যর্থ হয়ে বাতিলের পক্ষ থেকে আলোচনা, সহাবস্থান, বোঝাপড়া, শান্তিচুক্তি, ঐক্য ইত্যাদি মুখরোচক স্লোগানের মাধ্যমে হক্ব-বাতিলকে ওলটপালট করার চেষ্টা করা হয়।

রহমাতুল্লিল আলামীনের বিরুদ্ধে জাযিরাতুল আরবের সবচেয়ে বড় পরাশক্তি কুরাইশের সর্দারশ্রেণী যখন দেখল যে, ইসলামকে জোর করে দাবিয়ে রাখার প্রয়াস বারবারই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে, তখন তারাও শান্তিচুক্তি, আলোচনা ও সহাবস্থানের নামে অসাম্প্রদায়িকতার ঢোল পেটাতে শুরু করল। তাদের পক্ষ থেকে রহমাতুল্লিল আলামীন ﷺ এর কাছে বিভিন্ন প্রস্তাবনা পেশ করতে শুরু করল।

সন্ধির প্রস্তাবনা

ইমাম বাগাভী রহ. বলেন, একদিন মক্কা মুকাররমার পাঁচজন লোক আব্দুল্লাহ ইবনে উমাইয়া মাখযূমী, ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা, মিকরায ইবনে হাফস, আমর ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আবী কাইস আল-আমেরী ও আস ইবনে ওয়ায়েল নবী কারীম ﷺ এর কাছে এল। তারা বলল, আপনি যদি চান যে, আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি; তবে আপনি এই কুরআন বাদ দিয়ে আরেকটি কুরআন নিয়ে আসুন।

আল্লাহ তাআলা তাদের এ প্রস্তাবনাকে এভাবে বর্ণনা করেছেন-

﴿ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ ﴾

"আর যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন সে সমস্ত লোক, যারা আমার সাক্ষাতের আশা রাখে না, তারা বলে- এটি ছাড়া অন্য কোনো কুরআন নিয়ে এস, অথবা একে পরিবর্তন করে দাও।

সুতরাং আমাদের ও আপনার মাঝে সন্ধির একটি মাত্র পথ আছে। ঘৃণাভরা, শান্তি-কৃংখলা ও নিরাপত্তা বিনষ্টকারী বিষয়গুলো বন্ধ করা হোক। এর জন্য আবশ্যক হলো, এ কুরআন বাদ দিয়ে অন্য কোনো কুরআন নিয়ে আসুন। যেখানে লাত, মানাত ও উজ্জার উপাসনার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা নেই। অথবা এ কুরআনে পরিবর্তন করুন। সেখান থেকে এমন সব কথা বের করে দিন; যাতে আমাদের জীবনব্যবস্থা ও মূর্তি সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করা হয়েছে। আমাদের কাছে আমাদের পার্লামেন্টে (দারুন নাদওয়া) অনুমোদিত আইনকানুন ও জীবনব্যবস্থাকে ত্যাগ করার দাবি জানানো হয়েছে। আমাদের জীবনব্যবস্থায় যেসব বিষয়কে হারাম বলা হয়েছে, তা হালাল করে দেওয়া হোক। আমরা যাদেরকে উপাস্য বানিয়েছি, যাদেরকে আমরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার সাথে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দিয়েছি; এ কুরআন তা হারাম বলছে, তাকে বাতিল ও তাগুত বলছে। সুতরাং তাতে সংস্কার করা হোক। যা হালাল বলা হয়েছে তা হারাম করা হোক।

কিন্তু আসল উপাস্য আল্লাহ তাআলা প্রিয় নবীকে বলেন-

﴿ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾

"আপনি বলে দিন, একে নিজের পক্ষ থেকে পরিবর্তন করা আমার কাজ নয়। আমি সে নির্দেশেরই আনুগত্য করি, যা আমার কাছে আসে। আমি যদি স্বীয় প্রতিপালকের নাফরমানি করি; তবে কঠিন দিবসের আযাবের ভয় করি।"

আজ চৌদ্দশ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও কুফরের মানস যেমন পরিবর্তিত হয়নি, তেমনি কাফের বিদ্রোহীদের কর্মপন্থাও পরিবর্তিত হয়নি। সারা বিশ্বের কুফরীশক্তি জাতীয় হোক বা প্রাদেশিক, এক আল্লাহকে উপাস্য মান্যকারীদের কাছে এমনই দাবি করছে যে, কুরআনের এমন সব কথা বলা থেকে বিরত থাকুন- যা কাফেরদের অপছন্দ হয়, যেসব কথায় কাফেরদের তৈরি আন্তর্জাতিক এবং দেশীয় উপাস্যসমূহকে (জীবনব্যবস্থা ও রাষ্ট্র পরিচালনার আইন) মন্দ বলা হয়। এবং এ কুফরীব্যবস্থা শেষ করে দিয়ে শুধুমাত্র এক আল্লাহর নাযিলকৃত জীবনব্যবস্থা বাস্তবায়নের কথা বলা হয়ে থাকে।

চিন্তার মুহূর্ত

আল্লাহ তাআলা স্বীয় রাসূলের পবিত্র মুখে ঘোষণা করিয়ে দিয়েছেন যে, এতে কোনো ধরনের পরিবর্তন করা অসম্ভব। এটিই কুরআন, যা আমার ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। এটাকেই মানতে হবে। সন্ধির অন্য কোনো ধরন অসম্ভব।

কিন্তু আজকের যুগের ধর্মীয় সন্ধি স্থাপনকারীদের দেখুন, বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে আগামীর দিনগুলোতে কুফর ও ইসলামকে এক করার নামে মেলা সাজাচ্ছে। তাদের মাঝে পারস্পরিক ঐক্য, সৌহার্দ্য, মৈত্রী, সহমর্মিতা সৃষ্টি করার প্রয়াস চালাচ্ছে। কখনো জাতীয়তার দোহাই

দিয়ে, কখনো গণতন্ত্রের ধোঁয়া তুলে, কখনো আবার রাষ্ট্রদেবীর পবিত্রতার নামে একাকার হওয়ার আতশবাজিতে আগুনের স্ফুলিঙ্গ ওপরে ওঠছে।

আল্লাহ আমাদের সহায় হোক! বিবেক তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়, যখন সেই মেলায় এমন সব লোককেও দেখি- যাদেরকে দ্বীনি ইলমের ধারকবাহক ভাবা হয়। কুফর ও ইসলামের মাঝে ঐক্য ও সৌহার্দ্য, আল্লাহ ও মূর্তির মাঝে ঐক্যবদ্ধতা- এ ব্যাপারে শ্রেষ্ঠ নবী ﷺ এর ভাষায় দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে যে-

﴿ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ ﴾

“আপনি বলে দিন, একে নিজের পক্ষ থেকে পরিবর্তন করা আমার কাজ নয়। আমি সে নির্দেশেরই আনুগত্য করি, যা আমার কাছে আসে।”

কিন্তু সেই জ্ঞানপাপীদের আল্লাহর ওপর কী দুঃসাহস দেখো, কেমন হঠকারিতার সাথে এসব কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করছে এবং তা ছবি করে বিশ্ববাসীকেও সেই দুঃসাহসের সাক্ষী বানাচ্ছে। এসব জ্ঞানপাপীরা সেসব মেলায় এ জন্যই অংশ নেয় যে, নিজের কথা ও লেখা বিক্রি করে পার্থিব ভোগ-বিলাসের উপকরণ কিনবে। আল্লাহর আয়াতের কথা বলে নিজেদের পেটকে জাহান্নামের গর্তে পরিণত করবে।

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾

“নিশ্চয় যারা সেসব বিষয় গোপন করে, যা আল্লাহ কিতাবে নাযিল করেছেন এবং সেজন্য অল্প মূল্য গ্রহণ করে, তারা আগুন ছাড়া নিজের পেটে আর কিছুই ঢুকায় না। আর আল্লাহ

কিয়ামতের দিন তাদের সাথে কথা বলবেন না, আর তাদের পবিত্র করবেন না, বস্তুত তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।”

﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ﴾

এরাই হলো সে সমস্ত লোক, যারা হিদায়াতের বিনীময়ে গোমরাহী খরিদ করেছে এবং (খরিদ করেছে) ক্ষমা ও অনুগ্রহের বিনীময়ে আযাব। অতএব, তারা দোযখের ওপর কেমন ধৈর্যধারণকারী!

দ্বিতীয় প্রস্তাবনা

এ প্রস্তাবনায় মুফাসসিরগণ বিভিন্ন পয়েন্ট উল্লেখ করেন। ইমামুল মুফাসসিরীন ইবনে জারীর তবারী রহ. ইবনে আব্বাস রাযি. এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন, একদিন মক্কার সর্দারশ্রেণীর কিছু লোক নবী কারীম ﷺ এর সাথে সাক্ষাৎ করল। তারা বলল, হে মুহাম্মাদ! আমরা আপনাকে এত সম্পদ দেব যে, আপনি মক্কার সবচেয়ে ধনী হয়ে যাবেন এবং আরবের সবচেয়ে সুন্দরী রমণীকে আপনার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিয়ে দেব। এটি আমাদের পক্ষ থেকে আপনার কাছে প্রস্তাবনা। এর বিনীময়ে আপনি আমাদের প্রভুদের ব্যাপারে মন্দ কথা বলা থেকে বিরত থাকবেন। তাদের মানহানি করবেন না। যদি এটি আপনি গ্রহণ না করেন; তবে আরও একটি প্রস্তাব আমাদের পক্ষ থেকে আছে, যাতে রয়েছে আমাদের উভয়ের কল্যাণ। রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, সেটি কী? তারা বলল, এক বছর আপনি

আমাদের প্রভু লাত-উজ্জার উপাসনা করুন। আমরা এক বছর আপনার প্রভুর উপাসনা করব। এই প্রেক্ষিতেই সূরা কাফিরূন অবতীর্ণ হয়।

আবু জাহেলের ধর্মনিরপেক্ষ প্রস্তাবনা

ইমাম আবুল লাইস সমরকন্দী রহ. তাঁর তাফসীর গ্রন্থে ইমাম মুকাতিল রহ. এর এ রেওয়ায়েতে আবু জাহেলের এক আশ্চর্যজনক প্রস্তাব বর্ণনা করেন।

ندخل معك في بعض ما تعبد وتدخل معنا في بعض ديننا أو نتبرأ من آلهتنا وتتبرأ من إلهك.

'আমরা আপনার সাথে আপনাদের কিছু ইবাদতে অংশ নেব। আপনিও আমাদের দ্বীনের কিছু গ্রহণ করবেন। অথবা আমরা আমাদের প্রভুদের থেকে পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আপনিও আপনার প্রভু থেকে পবিত্রতা ঘোষণা করুন।'

এ প্রস্তাবনার প্রথম অংশ 'আমরা আপনার সাথে আপনাদের কিছু ইবাদতে অংশ নেব। আপনিও আমাদের দ্বীনের কিছু গ্রহণ করবেন' আজকের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিদ্যমান ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ আবারও মুসলমানদের কাছে এটাই পেশ করছে। সেক্যুলার ব্যক্তি (সে আসল কাফের হোক বা মুসলমান নামের সেক্যুলার হোক) ইসলামের ইবাদতসমূহ ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে যোগ দিতে প্রস্তুত। নিজ নিজ দেশে সেটির অনুমতি; বরং সেটির সহায়তার জন্যও প্রস্তুত। কিন্তু জীবনব্যবস্থা ও সংবিধানের প্রশ্নে সে চুল পরিমাণও পিছু হটতে প্রস্তুত নয়; বরং এ ব্যাপারে এদের চাওয়া হলো, সংবিধান ও জীবনব্যবস্থার ক্ষেত্রে আপনাদেরকে আমাদের সিস্টেমেই আসতে হবে। মানতে হবে গণতন্ত্র, বৈশ্বিক সুদব্যবস্থা, জাতীয়তাবাদ-

যেটি শত্রুতা ও বন্ধুত্বের মাপকাঠি, নারী স্বাধীনতা, প্রবৃত্তি ও মুক্তচিন্তার ওপর ভাসমান জীবন। আর এটিকে আদর্শ জীবন ও অনুকরণীয় ব্যবস্থা হিসেবে মানতে হবে। সুতরাং কেউ যদি এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলতে চায়, তখন প্রত্যেক রাষ্ট্রই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দেয়। আর ততক্ষণ পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলতে থাকে, যতক্ষণ না সে তাদের মতবাদকে স্বীকার করে নেয়।

এটি আবু জাহেলের প্রস্তাবের প্রথমাংশ। আবু জাহেল বিশ্বধর্মের যে প্রস্তাব করেছে, সে এ ব্যাপারটি মানতে কখনো প্রস্তুত ছিল না যে- রাষ্ট্রব্যবস্থা, আইন প্রণয়ন অর্থাৎ বৈধতা-অবৈধতাদানের ব্যাপারে সে হাত দেবে না।

তার প্রস্তাবনার দ্বিতীয় অংশ ছিল, 'আমরা আমাদের প্রভুদের থেকে পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আপনিও আপনার প্রভু থেকে পবিত্রতা ঘোষণা করুন'। অর্থাৎ কোনো ধর্ম মানারই প্রয়োজন নেই।

তার এ কথা শুনে মনে হচ্ছে, আবু জাহেল নিতান্ত বিশুদ্ধ চিন্তার সেক্যুলার ছিল; যে সর্বদা স্বীয় প্রবৃত্তির দাস ছিল। নিজের প্রভুদের মান-সম্মান (হানি হবে), তার জন্য এটা কোনো ব্যাপারই ছিল না। শুধু নিজের সর্দারি-রাজত্ব ও প্রবৃত্তিই তার প্রিয় ছিল। তা রক্ষা করার জন্য সে স্বীয় প্রভুদের থেকেও পবিত্রতা ঘোষণা করতে কুণ্ঠিত ছিল না।

এ সবগুলো প্রস্তাবনায় যদি লক্ষ্য করা হয়; তবে সবকিছুর একটিই সারমর্ম বেরিয়ে আসে। আমরা যে সংবিধান প্রণয়ন করেছি, পার্লামেন্টে (দারুন নাদওয়া) আমরা যেসব আইন পাশ

করেছি, সেসবের দুর্নাম করা যাবে না। আপনি ব্যক্তিগত ইবাদত চালিয়ে যান; কিন্তু আমাদের দ্বীন ও সংবিধানকে কুফর বলবেন না। কারণ, আমাদের ধর্ম মানে আল্লাহরই ধর্ম। এ কথাও বলবেন না যে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো হাতে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা নেই। সেই ক্ষমতাটি আমাদের প্রভুদের জন্যও মেনে নিন। হোক না সেটা কুফরী আইনকে ইসলামী প্রমাণ করার অপব্যাখ্যার মাধ্যমেই!

এখানে চিন্তার বিষয় হলো, কুরাইশ-সর্দার কি এতই নির্বোধ ছিল যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ এর কাছে সে এমন দাবি করেছিল; তাতে কি তার এ ক্ষতি ছিল না?- সে যখন এক বছর মুহাম্মাদ ﷺ এর প্রভুর ইবাদত করবে, তখন পুরো জাযিরাতুল আরবে বিদ্যমান তার অনুসারীদের মধ্যে কী প্রভাব পড়বে?

আমরা যদি কুরাইশ নেতৃবর্গের এ প্রস্তাবনাকে গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করি, তাহলে বুঝতে পারব যে, কোনো চিন্তা-ভাবনা করা ছাড়াই তারা নবী কারীম ﷺ এর দাওয়াতে বিরক্ত হয়ে এমন প্রস্তাব করে বসেছিল। কিন্তু যে ব্যক্তিই তাওহীদ ও কুফরের মানস বোঝে, সে বিশেষত মূর্তিপূজারি ধর্মের দিকে তাকিয়ে এ প্রস্তাবের গভীরতা আঁচ করতে পারবে। কুরাইশের বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ জানত যে, কেউ যদি একবার তাদের মূর্তির অবস্থানকে মেনে নেয়; তবে পরবর্তীতে সে কখনো নিজ আকীদার ওপর অবিচল থাকতে পারবে না। পরিশেষে সেও একদিন মূর্তিপূজাকেই গ্রহণ করবে।

মূর্তিপূজা কেমন ধর্ম বুঝতে চাইলে হিন্দুস্তানের হিন্দুধর্মের ইতিহাস পড়তে পারেন। হিন্দুধর্ম কত সভ্যতা ও ধর্ম-বিশ্বাসকে গিলে খেয়েছে, আজ যার অস্তিত্বও বাকি নেই। খৃষ্টধর্মকে শিরকের নর্দমায় নিক্ষেপ করেছে এ মূর্তিপূজাই।

মূর্তিপূজা এমন ধর্ম, যার কোনো উৎস ও ভিত্তি নেই; বরং এটি শতভাগ সেক্যুলার তথা প্রবৃত্তির ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। অভিজাতশ্রেণীর (আরবে ছিল কুরাইশ কাফের, হিন্দুস্তানে ব্রাহ্মণসম্প্রদায়) যাকে ইচ্ছে হয়েছে, তাকেই প্রভুর স্থান দিয়েছে। কারণ, বাধাদানকারী কোনো ভিত্তিই তো (ওদের) ছিল না! তবে আসমানী ধর্ম তার ব্যতিক্রম। যে কোনো শক্তিশালী, উপকারী, ক্ষতিকর বা জনপ্রিয় মানুষ আসে, (মূর্তিপূজারিরা) এটিকে নিজের প্রমাণ করে নিজের অবস্থান তৈরি করে এবং পরে তারই পূজা করতে থাকে।

হয়তো এ কারণেই হিন্দুত্ববাদের সর্দারশ্রেণীর (ব্রাহ্মণদের) ইসলাম গ্রহণের হার অন্যান্য জাতির তুলনায় অনেক কম। কারণ, আপনি তাকে যত দলিলই দিন না কেন, সে তা মেনে নিলেও; সত্যের গ-িতে আসার পরিবর্তে সেই সত্যকেই নিজের প্রবৃত্তি মতে ঢেলে সাজাবে। সেই ধর্ম গ্রহণ করার পরিবর্তে সেটিকে হিন্দুত্ববাদে এমনভাবে অন্তর্ভুক্ত করে নেবে যে, সে ধর্মের অস্তিত্বের খবরও জানা যাবে না। যেমন, আপনি তাদেরকে যদি আল্লাহ তাআলার সত্তার ব্যাপারে দলিল দিয়ে বুঝান, তখন তারা তা বুঝবে ঠিক; কিন্তু তা এমন পন্থায় মানবে যে, আল্লাহর জন্যও একটি মূর্তি বানিয়ে সামনে রেখে দেবে। তাই প্রমাণিত সত্য হলো, অধিকাংশ ব্রাহ্মণ সত্য গ্রহণ করার পরও মুসলমান হতে পারে না; তবে ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে।

সুতরাং কুরাইশ পৌত্তলিকদের এ চুক্তির ফলাফল খুব খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এতে মক্কার কাফেরদেরই ফায়দা হতো। কারণ এ চুক্তির পর আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত দেওয়া সম্ভব হতো না।

এ ঘটনার মাঝে বর্তমান ঐ সকল লোকদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় আছে, যারা ইসলাম ও হিন্দুত্ববাদ বা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ও অন্যান্য মতাদর্শের মাঝে পারস্পরিক সম্প্রীতি, বোঝাপড়া ও সাম্প্রদায়িক সহাবস্থানের নামে ইসলাম ও কুফরকে একীভূত করে মুসলমানদেরকে প্রকাশ্য কুফরের দিকে দাওয়াত দিচ্ছে।

উপমহাদেশের হক্কানী উলামায়ে কেরাম যুগে যুগে মুসলমানদেরকে এ ধরনের কুফরী চুক্তি ও উদ্যোগের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভী রহ. ‘দ্বীনে হক্ব ওয়া উলামায়ে রব্বানী’ নামক রিসালায় বলেন, আম্বিয়ায়ে কেরাম আ. কুফরকে পরিপূর্ণরূপে মূলোৎপাটন করতেন। তাঁরা কুফরের প্রতি এবং তাদের সাথে নমনীয় চুক্তি সম্পাদনের প্রতি সহিষ্ণু ছিলেন না। কুফরের পরিচয় চেনার ক্ষেত্রে তাঁদের দারুণ যোগ্যতা ছিল। এক্ষেত্রে তাঁদের দৃষ্টি ছিল খুবই তীক্ষ্ম ও সুদূরপ্রসারী। আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে এ ব্যাপারে পরিপূর্ণ হেকমত ও দৃঢ়তা দান করেছেন। আল্লাহপ্রদত্ত বিচক্ষণতা ও অন্তর্দৃষ্টির ওপর ভরসা করা ছাড়া তাঁদের কোনো উপায় নেই। দ্বীনের হেফাজতের জন্য এটাই একমাত্র উপায় যে, ইসলাম ও কুফরের যে সীমানা তাঁরা স্থাপন করে দিয়েছেন এবং যে নিদর্শনাবলি তাঁরা উল্লেখ করে দিয়েছেন, তার পরিপূর্ণ হেফাজত করতে হবে। এর মধ্যে সামান্য উদারবোধ ও সহিষ্ণুতা

দ্বীনকে এমনভাবে বিকৃত করে ফেলে, যেমনিভাবে ইয়াহুদী ধর্ম, খৃষ্টান ধর্ম ও ভারতের ধর্মসমূহ বিকৃত হয়ে পড়েছে।

হক্কানী উলামায়ে কেরাম সম্পর্কে তিনি লেখেন, আম্বিয়ায়ে কেরাম আ. এর সত্যিকারের অনুসারীগণও এ বিষয়ে তাঁদের মতো বিচক্ষণতা ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে থাকেন। তাঁরা এক এক করে কুফরের সকল নিশানা মুছে ফেলেন। এক এক করে জাহিলিয়্যাতের দাগ দূরীভূত করেন। কুফর শনাক্ত করার ক্ষেত্রে তাঁদের বোধশক্তি সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে। কুফর যে বেশে এবং যে আকৃতিতেই আসুক না কেন, তা তাঁরা ঠিকই ধরে ফেলেন এবং নিজের কোমর বেঁধে তার বিরোধিতায় নেমে পড়েন। কখনো তাঁরা ভারতে বিধবাদের দ্বিতীয় বিবাহকে হারাম মনে করা ও তার প্রতি প্রবল ঘৃণা পোষণ করার মাঝে কুফরের গন্ধ পান এবং সেটার (বিধবাদের দ্বিতীয় বিবাহ) প্রচার-প্রসার ঘটানো এবং এই সুন্নাহকে জীবিত করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। অনেক সময় তার জন্য জানবাজি রেখে সংগ্রাম করেন। কখনো শরয়ী কানুনের ওপর প্রচলিত রীতি-রেওয়াজকে প্রাধান্য দেওয়া এবং বোনদেরকে মিরাস-অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জোর দেওয়াকে তাঁদের নিকট কুফরী মনে হয় এবং এ ধরনের লোকদের বিরোধিতা ও তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করাকে ফরয মনে করেন তাঁরা। কখনো আল্লাহ ও রাসূল ﷺ এর পরিষ্কার বিধান জানার পর না মানা এবং গাইরে ইলাহী আদালত ও আইনের আশ্রয় নেওয়া ও অনৈসলামিক আহকাম ও কানুন প্রতিষ্ঠা করাকে ইসলামের গ-ি থেকে খারিজকারী বিষয় বলে মনে হয় তাঁদের নিকট এবং তাঁরা এর প্রতিবাদ করতে অপারগ হলে সেখান থেকে হিজরত করে চলে যান। কখনো কোনো

নওমুসলিম বা এমন মুসলিম, যে অমুসলিমদের সাথে ওঠাবসা করে এবং এমন জবাইকৃত জন্তু ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকে ও তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাকে ঘৃণা করে, যে জবাইকৃত জন্তু থেকে তাদের মিত্র জাতি ও দেশবাসী প্রবলভাবে বেঁচে থাকে। আর এ বিষয়ে তাদের মধ্যে যথেষ্ট ঘৃণা ও দূরত্ববোধ রয়েছে। এমন মুসলমানদের ঈমানে দুর্বলতা ও তাদের মাঝে পুরাতন ধর্ম বা অমুসলিমদের ধর্মের প্রভাব আছে বলে মনে করেন তাঁরা।

যুগে যুগে এ ধরনের আল্লাহওয়ালা ও সত্যপথে অবিচল পথিকদের বিরুদ্ধে অনেক কথা হয়েছে। বিষাক্ত তীর-বর্শার আঘাত তাঁদের অন্তরকে চালনি করে দিয়েছে। তাঁদের বিরোধিতা ও যুক্তি খ-নের জন্য নফসের পূজারিদেরকে উচ্চ পর্যায়ের ক্ষমতাসম্পন্ন পদ-পদবি ও নিকৃষ্ট পৃথিবীর নিকৃষ্ট সম্পদ প্রতিদান হিসেবে দেওয়া হয়েছে; যার সাহায্যে তারা নিজেদের পেটে জাহান্নামের আগুন ভরেছে।

এ সম্পর্কে বলেন, তাঁদের যুগের নির্বোধ ও সকল ধর্মের মাঝে সাম্য ও সহাবস্থানের প্রবক্তারা তাঁদেরকে নিয়ে হাসাহাসি করেছে; যাঁরা হারাম ও মন্দির, কাবা ও প্রতীমার মাঝে পার্থক্য করাকেও কুফর মনে করে। তাচ্ছিল্যবশত তাঁদেরকে শহরের ফকীহ, সমালোচক, উর্বশী বক্তা ও খোদায়ী সেনাপতি নামে অভিহিত করেছে। তবুও তাঁরা পরিপূর্ণ স্থিরতা ও ধৈর্যের সাথে নিজেদের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে গেছেন। নিঃসন্দেহে এ লোকগুলো আম্বিয়ায়ে কেরাম আ. এর দ্বীনের হেফাজত করেছেন। আজ ইসলাম, খৃষ্টবাদ, ইয়াহুদীবাদ, ব্রাক্ষ্মণ্যবাদ ইত্যাদির মাঝে যে পার্থক্য দেখা যাচ্ছে, এটা তাঁদের সাহসিকতা, দৃঢ়তা ও বিচক্ষণতারই ফল।

এখানে কুফর ও হিন্দুত্ববাদের স্বরূপ ও প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করার উদ্দেশ্য হলো, যাতে এটা বোঝার পর এ বিষয়টাও বুঝতে সহজ হয় যে, ধর্মনিরেপক্ষ শাসনব্যবস্থা; যা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে গণতন্ত্রের রূপে প্রকাশিত। এটাও প্রকৃতি ও প্রভাবের দিক দিয়ে হিন্দুইজমের মতোই।

প্রত্যেক বিবেকবান ব্যক্তি জানে যে, সেক্যুলারিজম বা গণতন্ত্র আসলে প্রবৃত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত একটা ধর্ম (শাসনব্যবস্থা)। যেখানে প্রভাবশালী শ্রেণীর ইচ্ছাকেই দ্বীন, উপাস্য ও আইন হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বৈধতা ও অবৈধতা দানের পুরো ক্ষমতা এ শ্রেণীর হাতেই ন্যস্ত থাকে। এর অনুসরণ করা প্রত্যেক অধিবাসীর জন্য আবশ্যক করে দেওয়া হয়।

তবে প্রভাবশালী শ্রেণীর চাহিদাকে নির্ভরযোগ্য করার জন্য সেটাকে জনগণের রায় ও ইচ্ছা বলে নাম দেওয়া হয়। হিন্দুত্ববাদের মতো গণতন্ত্রের দেবীর কাছেও এ পার্থক্য নেই যে, তাকে কে মান্য করছে- ইয়াহুদী, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, না মুসলমান? সে সবার কাছ থেকে কেবল এটাই চায় যে, সবাই নিজ নিজ ধর্মের ওপর থাকুক আর তাকে শুধু আইন প্রণয়নের এখতিয়ার দিলেই হলো। অর্থাৎ জনগণের জীবন পরিচালনার নিয়ম-নীতি প্রবর্তন করার ক্ষমতা- যার দ্বারা যেটা ইচ্ছা মানুষের জন্য বৈধ আর যেটা ইচ্ছা তাদের জন্য অবৈধ ও আইন পরিপন্থী সাব্যস্ত করা যায়।

অতএব, যেমনিভাবে মক্কার পৌত্তলিকরা সর্বশেষ নবী ﷺ এর সামনে এ উদ্যোগ তুলে ধরেছিল যে, আপনি আপনার দ্বীনের ওপর থাকবেন; কিন্তু আমাদের কতক প্রতীমার সত্যতা

মেনে নেবেন। অথবা আপনার কিছু বিষয় আমরা মেনে নেব আর আমাদের কিছু বিষয় আপনি মেনে নেবেন। গণতন্ত্রও প্রত্যেক নাগরিক থেকে এতটুকুই চায়।

যে এটা মেনে নেয় তার সাথে গণতন্ত্রের কোনো লড়াই নেই। সে হয় সম্মানিত নাগরিক; চাই সে ইয়াহুদী অথবা খৃষ্টান বা হিন্দু হোক কিংবা চাই সে মুরতাদ হোক বা কট্টর নাস্তিক হোক। এ দেবীর দৃষ্টিতে সবার ধর্ম এক সমান। কেউ না মানলে সে হবে আতঙ্কবাদী এবং রাষ্ট্রের দেবী-মার বাগী বা বিদ্রোহী।

যাই হোক, মক্কার পৌত্তলিক সর্দাররাও রাসূল ﷺ এর নিকট এ ধরনের প্রস্তাবনা পেশ করল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁর নাযিলকৃত ধর্মের অপছন্দকারীদের এ জবাব দিয়ে আশাহত করে দিলেন যে, কিছু ইসলাম আর কিছু কুফরের খড়কুটো কখনো ইসলাম হতে পারে না। এখান থেকে কিছু ওখান থেকে কিছুর এ মিশ্রিত ধর্মটা কুফরই হবে।

আল্লামা যাফর আহমাদ উসমানী রহ. এলাউস সুনান এ বলেন-

قلت: وأما محاربة الرعية المسلمة ملكها الكافر بالمقاطعة الجوعية أو المظاهرة العامة فليس لها أصل في الشرع لم يستعملها أسلافنا المقيمون بدار الحرب مع ملكها قط، وإنما أخذها أبناء زماننا من أوربا و يجوز استعمال ما سوى الأول بعد النبذ إليهم على سواء إذا كنا نرجو الشوكة عليهم بذلك، وكان المقصود إعلاء كلمة الله والدعاء إلى الدين، دون إحرار الوطن وإقامة السلطنة الجمهورية المركبة من أعضاء بعضهم مسلمون وبعضهم كفرة مشركون، فإن بذل الجهد لذلك ليس من الجهاد في شيء لخلوه عن غرضه الأصلي وهو إعلاء كلمة الله والدعاء إلى الدين القويم ـ والسلطنة المركبة من الأعضاء المسلمين والكافرين لا يكون سلطنة إسلامية قط، وإنما هي

سلطنة الكفر لا سيما إذا كانت الكثرة لهم لا لنا، فإن المركب من الخسيس والشريف خسيس من الطيب والخبيث خبيث ـ

'আমি বলছি, এমন সাধারণ মুসলমান যাদের শাসক কাফের হয়; তাদের অনশন, হরতাল বা বিক্ষোভ মিছিল করা- শরীয়তে এসবের কোনো হাকীকত নেই। দারুল হরবে অবস্থানকারী আমাদের আসলাফদের কেউ এমন করেননি। আমাদের যমানার লোকেরা এসব ইউরোপ থেকে আমদানি করেছে। তবে অনশন ও হরতাল ব্যতীত বিক্ষোভ মিছিল করা ঐ অবস্থায় জায়েয হবে, যখন তা কাফেরদের সাথে কৃত চুক্তি শেষ করার ঘোষণা দেওয়ার জন্য হয় এবং এ মিছিল বা গণঅভ্যুত্থানের কারণে কাফেরদের ওপর বিজয় লাভ করার আশা করা যায়। উপরন্তু এর উদ্দেশ্য আল্লাহর কালেমার বুলন্দি ও কাফেরদেরকে আল্লাহর দ্বীনের প্রতি আহ্বান করা হতে হবে। দেশের স্বাধীনতা বা অন্য গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য হলে হবে না, যার কিছু সদস্য মুসলমান আর কিছু সদস্য কাফের। কারণ তার জন্য চেষ্টা করাকে জিহাদ বলা হবে না। এতে তার উদ্দেশ্য আল্লাহর কালেমার বুলন্দি ও স্পষ্ট দ্বীনের প্রতি দাওয়াত দেওয়া নয়।

আর এমন সরকার, যা মুসলমান ও কাফের সাংসদ নিয়ে গঠিত, এটা কখনো ইসলামী রাষ্ট্র হতে পারে না। নিঃসন্দেহে এটা কুফরী রাষ্ট্রই হবে। বিশেষ করে, যখন তার অধিকাংশ সদস্য কাফের হয়। কারণ নিকৃষ্ট ও উৎকৃষ্টের মিশেলে গঠিত বস্তু নিকৃষ্টই হয় এবং পবিত্র ও অপবিত্রের মিশ্রণে গঠিত বস্তু অপবিত্রই হয়।'

আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভী রহ. 'দ্বীনে হক্ব ওয়া উলামায়ে রব্বানী'তে বলেন, শিরক একটা স্বতন্ত্র ধর্ম ও পরিপূর্ণ শাসনব্যবস্থা (এ পরিপূর্ণতা মানবগড়া, যাতে শান্তি-সফলতার লেশমাত্রও নেই)। শিরক ও আল্লাহর ধর্ম কোনো শরীরে, কোনো মন-মানসিকতায় বা কোনো ভূখ-ে একসাথে জমা হওয়া সম্ভব নয়। এ গাইরে ইলাহী ধর্ম শরীরে ও মনে এবং এর বাহিরে এতটা জায়গা জুড়ে বিস্তৃত হয়, যতটা আল্লাহর ধর্মের জন্য মোটামুটি দরকার হয়।

একই পৃষ্টায় কয়েক লাইন পর তিনি বলেন, এজন্য যতক্ষণ পর্যন্ত জমিন থেকে শিরকের সকল শাখা এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শিকড় উপড়ে ফেলা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর দ্বীনের চারা লাগানো সম্ভব হবে না। কারণ এ চারা এমন জমিনে শিকড় গাড়ে না, যেখানে অন্য কোনো গাছের শিকড় বা বীজ থাকে। তার ডালপালা তখনই আসমানের সাথে কথা বলে এবং তখনই ফল-ফুল দেয়, যখন তার ভিত্তি ও শিকড় গভীর ও শক্ত হয়।

পরের পৃষ্ঠায় তিনি বলেন, সুতরাং যে সকল ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীনের স্বভাব ও স্বরূপ সম্পর্কে অবগত, তারা তাকে কোনো জায়গায় কায়েম করার জন্য সে জায়গাকে পরিপূর্ণরূপে পরিষ্কার, সমান ও উপযোগী করে নেয়। শিরক ও জাহিলিয়্যাতের সকল শিকড় খুঁজে খুঁজে বের করে দেয়। একটা একটা করে শিরক ও জাহিলিয়্যাতের বীজ উপড়ে ফেলে দিয়ে পুরো জমিনকেই একেবারে ওলট-পালট করে দেয়।

সামনে গিয়ে তিনি কুফরের সংজ্ঞা দিয়ে বলেন, কুফর হলো আল্লাহর দ্বীন ও তাঁর শরীয়তকে অস্বীকার করা। এ অস্বীকার করা মানে হলো, তাঁর হুকুমতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, তাঁর আহকাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া; চাই সেটা যে কোনো উপায়েই হোক বা যে কোনো আলামত দ্বারা

প্রকাশিত হোক। কুফরের এ সংজ্ঞা ঐসব লোকদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করে নিচ্ছে, যারা কোনো হুকুমকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ এর বিধান জানার পরও মান্য করে না বা মৌখিকভাবে স্পষ্ট অস্বীকার না করলেও ইচ্ছাকৃতভাবে তার বিরোধিতা করে। এ ধরনের লোক চাই অন্যান্য আহকামের যতই পাবন্দি করুক না কেন, কুফরের গ-ি থেকে বাহিরে নয়। আল্লাহ তাআলা ইয়াহুদীদের সম্বোধন করে বলেন-

﴿ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾

“তবে তোমরা কি কিতাবের (অর্থাৎ তাওরাতের) কিছু অংশে ঈমান রাখ এবং কিছু অংশ অস্বীকার কর? তাহলে বলো, যারা এরূপ করে তাদের শাস্তি এ ছাড়া আর কী হতে পারে?- পার্থিব জীবনে তাদের জন্য থাকবে লাঞ্ছনা আর কিয়ামতের দিন তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে কঠিনতর আযাবের দিকে। তোমরা যা-কিছু করছ, আল্লাহ সে সম্পর্কে উদাসীন নন।”

কেবলমাত্র আল্লাহর প্রভুত্ব ও সার্বভৌম ক্ষমতা স্বীকার করে নিলে স্বাভাবিকভাবে প্রভুত্ব ও হাকিমিয়্যাত (আইন ও বিধান প্রণয়নের অধিকার) এর দাবিদারদের প্রভুত্ব ও হাকিমিয়্যাতের অস্বীকার হয়ে যায়। কিন্তু যে সকল লোক বাতিল প্রভুদের প্রভুত্ব ও হাকিমিয়্যাতের (আইন ও বিধান প্রণয়নের অধিকার) স্পষ্ট অস্বীকার করতে প্রস্তুত নয় বা তারা এ কেবলার দিকে মুখ তো ফিরিয়ে নিয়েছে; তবে অন্য কেবলার দিকে তাদের পিঠ যায় না অর্থাৎ তা থেকে পরিপূর্ণরূপে মুখ ফিরিয়ে নেয়নি এবং তারা কখনো কখনো এর ওপর আমল করে, আবার প্রয়োজন পড়লে ওটার ওপরও আমল করে- প্রকৃতপক্ষে এরা ইসলামের আওতাভুক্ত নয়।

ঈমান বিল্লাহ তথা আল্লাহর ওপর ঈমান আনার জন্য কুফর বিত-তাগুত বা তাগুতকে অস্বীকার করা আবশ্যক।

কিছুদূর গিয়ে তিনি বলেন, এজন্য কুরআন এ ধরনের মানুষের ঈমানের দাবিকে মেনে নেয়নি, যারা গাইরে ইলাহী বিধি-বিধান এবং তার প্রবক্তা ও কেন্দ্রের প্রতি ঝুঁকে থাকে এবং তাদেরকে নিজের বিচারক ও ফায়সালাকারী স্বীকার করে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হচ্ছে-

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾

"(হে নবী!) আপনি কি তাদেরকে দেখেননি? যারা দাবি করে, তারা আপনার প্রতি যে কালাম নাযিল করা হয়েছে তাতেও ঈমান এনেছে এবং (ঈমান এনেছে) আপনার পূর্বে যা নাযিল করা হয়েছিল তাতেও, (কিন্তু) তাদের অবস্থা এই যে, তারা ফায়সালার জন্য তাগুতের কাছে নিজেদের মোকদ্দমা নিয়ে যেতে চায়? অথচ তাদেরকে আদেশ করা হয়েছিল, যেন সুস্পষ্টভাবে তাকে অস্বীকার করে। বস্তুত শয়তান তাদেরকে ধোঁকা দিয়ে চরমভাবে গোমরাহ করতে চায়।"

মুফতী মোখতার উদ্দীন শাহ সাহেব স্বীয় কিতাব 'ইসলামী আকাঈদ ওয়া নাযারিয়্যাত' এ লেখেন- বিরোধী বিধিবিধান ও গাইরুল্লাহর ইবাদত থেকে অসন্তুষ্টি:

এ মহান কালেমার মধ্যে এ কথার ওয়াদাও রয়েছে যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করব না। যে কানুন ও বিধান আল্লাহর কানুনের পরিপন্থী হবে বা রাসূল ﷺ থেকে প্রমাণিত পদ্ধতির সাথে সাংঘর্ষিক হবে, তার অস্বীকার করব। ১২ নং পৃষ্ঠায় সূরা নিসার ৬০

নং আয়াতের অনুবাদে ব্র্যাকেটের ভিতরে লেখেন- কেননা, আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রাসূল ﷺ এর ওপর ঈমান আনার জন্য আবশ্যক হলো, তাগুতকে অস্বীকার করা। তাগুতকে অস্বীকার করা ছাড়া ঈমানও গ্রহণযোগ্য নয় এবং খালেছ ইবাদতও সম্ভব নয়। কিন্তু এই দুর্বল ও মস্তিষ্ক-ঢিলাগোষ্ঠী উভয়টাকে জমা করতে চায়; অথচ এটা একটা শয়তানি চাল।

পরের পৃষ্ঠায় লেখেন, এ আয়াতসমূহ থেকে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল ﷺ এর ওপর ঈমান আনার জন্য তাগুত তথা দ্বীন ইসলামের পরিপন্থী আইন-কানুনকে অস্বীকার করা আবশ্যক।

إلا الذين آمنوا এর সারমর্ম

إلا الذين آمنوا এর সারমর্ম হলো, আল্লাহর প্রতি ঐ ঈমানই গ্রহণযোগ্য হবে যেটার সাথে সাথে গাইরুল্লাহকে অস্বীকার করা হবে। গাইরুল্লাহকে অস্বীকার করা ব্যতীত ঈমান গ্রহণযোগ্য হবে না। সুতরাং এ ক্ষতি থেকে কেবল ঐ ব্যক্তিই বাঁচতে পারবে, যে আল্লাহ ব্যতীত বর্তমান যুগের সকল উপাস্যের ইনকার বা অস্বীকার করবে। তাদের সকল শক্তি, ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠান থেকে বিমুখতা ঘোষণা করবে; যাদেরকে হালাল ও হারাম নির্ধারণ করা এবং আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এবং মুহাম্মাদ ﷺ এর আনীত নেজাম ও শাসনব্যবস্থার প্রতিই পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখবে।

﴿وعملوا الصالحات﴾

ইমাম ইবনে জারীর তবারী রহ. বলেন, এখানে উত্তম আমলকারী বলতে ঐসব লোকই উদ্দেশ্য; যাঁরা আল্লাহর পক্ষ থেকে অত্যাবশ্যকীয় সকল ফরয বিধান আদায় করে এবং আল্লাহর সব ধরনের নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকে।

মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন-

اشترو الآخرة بالدنيا واختاروا رضى المولى على مطالبة النفس والهوى

অর্থাৎ 'উত্তম আমলের সার কথা হলো, দুনিয়া বিক্রি করে আখিরাত ক্রয় করে নিতে হবে এবং প্রবৃত্তির চাহিদার বিপরীতে আল্লাহর সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দিতে হবে।'

কাদিয়ানী তৎপরতা শুরু হওয়ার পূর্বে যদিও আলাদাভাবে এ বিষয়টা সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়োজন ছিল না যে, জিহাদও আমালে সালেহা তথা উত্তম আমলের অন্তর্ভুক্ত; শুধু তাই নয়, জিহাদ দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ ও স্পষ্ট একটি ফরয বিধান। যা সাধারণভাবে অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রু হেফাজতে থাকাবস্থায় ফরযে কেফায়া এবং দুনিয়ার কোথাও মুসলমানদের জান-মাল বা ইজ্জত-আব্রু ক্ষতিগ্রস্ত হলে যথারীতি তা ফরযে আইন হয়ে যায়। এ ছাড়াও যে ভূখ-ে কিছুক্ষণ শরয়ী হুকুমত কায়েম থাকার পর সে জায়গায় যদি শরয়ী হুকুমতকে বাতিল করা হয়, সেখানে পুনরায় শরয়ী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করার জন্য জিহাদ করা ফরযে আইন।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা হলো, কোনো ফরয ত্যাগ করা কবীরা গোনাহ এবং শরয়ী কারণ ব্যতীত যে ব্যক্তি কোনো একটা ফরয বিধান পরিত্যাগ করে, সে ফাসেক।

সুতরাং জিহাদসহ অন্যান্য যে সকল আহকাম আল্লাহর সর্বশেষ রাসূল ﷺ পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন, তা পালন করা এবং যে বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকার হুকুম দিয়েছেন, তা থেকে বিরত থাকা আমালে সালেহা বা উত্তম আমলের অন্তর্ভুক্ত।

﴿ وتواصوا بالحق﴾

আর ঐসব লোক যাঁরা পরস্পর কুরআন এবং তাওহীদের উপদেশ দেয়। ইমাম রাযী রহ. এর তাফসীরে বলেন-

فالتواصي بالحق يدخل فيه سائر الدين من علم وعمل

‘অর্থাৎ তাওয়াছী বিল হক্ক (পরস্পরকে হক্কের উপদেশ প্রদান করা) এর মধ্যে সম্পূর্ণ দ্বীন বিদ্যমান আছে অর্থাৎ ইলম ও আমল।’

কাযী ছানাউল্লাহ পানিপতি রহ. বলেন, এখানে হযরত হাসান বসরী রহ. ও ইমাম কাতাদা রহ. বলেন, الحق দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কুরআন আর ইমাম মুকাতিল রহ. বলেন, হক্ক দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হলো ঈমান ও তাওহীদ। সামনে গিয়ে তিনি বলেন-

مسئلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، من ترك كان من الخاسرين

‘আমল বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার (সৎকাজে আদেশ, মন্দ কাজে নিষেধ) করা ওয়াজিব। যে তা পরিত্যাগ করবে, সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।’ সুতরাং وتواصوا بالحق বলে ঐ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সমস্ত আহকাম ও বিধি-বিধানের ওপর পরিপূর্ণ আমল করার উপদেশ দেওয়া ছাড়া ক্ষতি থেকে পরিপূর্ণরূপে বাঁচা যাবে না। কারণ

কোনো সমাজে যদি কোনো কর্ম এককভাবে করা হয়, অন্যদেরকে তার উপদেশ প্রদান করা বা তার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা না হয়; তাহলে এ ভালো কর্মটি ব্যাপক হয় না; বরং এক সময় এমন হয় যে, ঐ ভালো কর্মকারী লোকটাও তা ছেড়ে বসেন এবং তিনি নিজেও পরিবেশের সাথে একীভূত হয়ে যান। নেক আমল করা এবং অন্যদেরকে তার প্রতি দাওয়াত দেওয়া মানুষকে ঐ আমলের ওপর অটল ও স্থির থাকতে সহায়তা করে এবং অন্যদেরকে ঐ আমলের ওপর আনার কারণ হয়। وتواصوا بالحق এর এ মেহনতের বদৌলতে সমাজের অধিকাংশ লোক ঐ নেক আমলের ওপর আমল করা শুরু করে। এভাবে যদি কেউ নিজে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকে; কিন্তু সমাজকে ঐ মন্দ কাজে লিপ্ত দেখে তাদেরকে তা থেকে বিরত থাকার উপদেশ না দেয়, তখনও এক সময় ঐ খারাপ কাজের প্রতি তার ঘৃণা দূর হয়ে যায় এবং তার অবস্থাও অন্যদের মতো হয়ে যায়। এজন্যই সমাজে وتواصوا بالحق এবং আমর বিল মারুফ ও নাহী আনিল মুনকার বন্ধ হয়ে যাওয়াকে কুরআনের দৃষ্টিতে খুব অপছন্দনীয় বিষয় সাব্যস্ত করা হয়েছে। কুরআনের অনেক জায়গায় এ চিন্তাধারার অনিষ্ট সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে-

﴿ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾

“তারা যেসব গর্হিত কাজ করত, তা থেকে তারা একে অপরকে বারণ করত না। তারা যা করত, তা কতই না নিকৃষ্ট।”

এটা ছিল বনী ইসরাঈলের অবস্থা। আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর আম্বিয়া আ. এর যবানের মাধ্যমে লা’নত করেছেন এবং তাদেরকে বানর-শুকর বানিয়ে দিয়েছেন।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِنَّ أَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلَى بَنِى إِسْرَائِيلَ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ فَيَقُولُ يَا هَذَا اتَّقِ اللَّهِ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لَكَ ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ فَلاَ يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ ثُمَّ قَالَ ﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ فَاسِقُونَ﴾ ثُمَّ قَالَ كَلاَّ وَاللَّهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدَىِ الظَّالِمِ وَلَتَأْطُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا وزاد في رواية

﴿ أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ ﴾

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, “বনী ইসরাঈলের মধ্যে সর্বপ্রথম যে অনিষ্ট প্রবেশ করে তা হলো- তাদের এক ব্যক্তি যখন অপর ব্যক্তির সাথে মিলিত হতো; তখন বলত, হে অমুক! আল্লাহকে ভয় কর এবং যে গোনাহ তুমি করছ; তা ত্যাগ কর, তোমার জন্য এটা বৈধ নয়। কিন্তু পরবর্তী দিন যখন এ (উপদেশদাতা) ব্যক্তি ওর সাথে মিলিত হতো, তখন ঐ ব্যক্তির গোনাহ এ (উপদেশদাতা) ব্যক্তিকে তার সাথে খাবারদাবার করতে এবং তার সাথে ওঠাবসা করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হতো না। তারা যখন এ ধরনের কাজ করতে শুরু করল, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের দিলসমূহকে পরস্পর মিলিয়ে কালো করে দিলেন। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করলেন, (বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল, তারা দাউদ ও মারইয়াম তনয় কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল।) রাসূল ﴿ فاسقون ﴾ ﷺপর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন। তারপর বললেন- সাবধান, আল্লাহর কসম! তোমরা আমর বিল মারুফ

ও নাহি আনিল মুনকার সব সময় করবে। জালেমের হাত অবশ্যই ধরবে এবং তাকে হক্কের দিকে উদ্বুদ্ধ করবে। তুমি তাকে হক্কের ওপর যেভাবে রাখা উচিত সেভাবে অটল রাখবে।”

অন্য রেওয়ায়েতে একটু প্রবৃদ্ধি রয়েছে- “যদি তোমরা এমনটি না করো; তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাদের অন্তরসমূহকে পরস্পর মিলিয়ে কালো করে দেবেন। তারপর তিনি তোমাদের প্রতি অভিসম্পাত করবেন যেমনটি তিনি বনী ইসরাঈলের ওপর করেছিলেন।”

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْحَى الله عَزَّ وَجَلَّ إِلَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنِ اقْلِبْ مَدِينَةَ كَذَا وَكَذَا بِأَهْلِهَا، قَالَ: فَقَالَ: يَا رَبِّ إِنَّ فِيهِمْ عَبْدَكَ فُلَانًا لَمْ يَعْصِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ، قَالَ: فَقَالَ: اقْلِبْهَا عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيَّ سَاعَةً قَطُّ

হযরত জাবের রাযি. বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, “আল্লাহ তাআলা হযরত জিবরাঈল আ. কে নির্দেশ দিলেন- অমুক বস্তিকে তাদের অধিবাসীসহ উল্টে দিয়ে আস। হযরত জিবরাঈল আ. আরয করলেন, হে প্রভু! ঐ বস্তিতে তো আপনার অমুক বান্দাও থাকে, যে পলক পড়া পরিমাণও আপনার নাফরমানি করেনি। আল্লাহ তাআলা বললেন, তাকে-সহ পুরো বস্তিকে উল্টিয়ে দাও। কারণ, তার চেহারা আমার জন্য কখনো পরিবর্তন হয়নি। অর্থাৎ বস্তিতে আমার নাফরমানি হচ্ছিল; কিন্তু আমার প্রতি ভালোবাসার দরুন তার চেহারায় (লোকদের নাফরমানির প্রতি) ঘৃণাও প্রকাশ পায়নি।”

عن قيس بن أبي حازم قال: قرأ أبو بكر الصديق هذه الآية: {يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم} قال: إن الناس يضعون هذه الآية على غير موضعها ألا وإني سمعت

رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه - أو قال:

المنكر فلم يغيروه - عمهم الله بعقابة

হযরত কায়েস ইবনে আবু হাযেম রাযি. বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন- ["হে মুমিনগণ, তোমাদের দায়িত্ব তোমাদেরই ওপর। তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও; তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে, সে তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহর দিকেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তোমরা যা করতে তিনি সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে অবহিত করবেন।" -সূরা মায়িদা: ১০৫] তারপর তিনি বললেন, লোকেরা এই আয়াতকে তার আপন স্থানে ব্যবহার করে না। সাবধান! আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, "লোকেরা যখন জালিমকে দেখবে; কিন্তু তাকে বাধা দান করবে না। অথবা বলেছেন, যখন কোনো খারাপ কাজ দেখার পরও তাতে বাধা দেবে না, তখন আল্লাহ ব্যাপক আকারের আযাব প্রেরণ করবেন।"

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فكان فيما قال ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه قال فبكى أبو سعيد فقال قد والله رأينا أشياء فهبنا

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, একদিন রাসূল ﷺ খুতবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে দাঁড়ালেন। তারপর খুতবায় বললেন, "সাবধান! কোনো লোকের ভয়ে সত্য বলা থেকে বিরত থাকবে না।" এটা শুনে হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. কেঁদে দিলেন এবং বললেন, 'আল্লাহ! আমরা তো কত গলদ ও না-হক্ব বিষয় দেখে ভয়ে চুপ ছিলাম!'

এক বর্ণনায় এই শব্দগুলোর প্রবৃদ্ধি উল্লেখ আছে-

فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق , أو يذكر بعظيم

“কেননা, সত্য বলা এবং কোনো বড় মানুষকে সত্য সম্পর্কে অবহিত করা মৃত্যুকে তরান্বিত করবে না এবং রিযিক থেকেও দূরে সরিয়ে দেবে না।”

عن ابن عمر، رضي الله عنه، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم، فليسومنكم سوء العذاب، ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم، لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، أو ليبعثن الله عليكم من لا يرحم صغيركم، ولا يوقر كبيركم

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, “তোমরা অবশ্যই ভালো কাজের আদেশ দিতে থাকো এবং মন্দ কাজ থেকে বাধা দিতে থাকো। অন্যথায় আল্লাহ তাআলা তোমাদের ওপর খারাপ লোকদেরকে চাপিয়ে দেবেন। ফলে তারা তোমাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তি দেবে। অতঃপর তোমাদের মধ্য হতে ভাল লোকেরা দুআ করবে; কিন্তু তাদের দুআ কবুল হবে না। তোমরা অবশ্যই সৎকাজের আদেশ দিতে থাকো এবং মন্দ কাজ থেকে বাধা দিতে থাকো। অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের ওপর এমন লোকদের পাঠাবেন; যারা তোমাদের ছোটদের প্রতি রহম করবে না এবং তোমাদের বড়দেরকে সম্মান করবে না।” হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. বলেন, আর তাঁকে এটাও বলতে শুনেছি-

من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مخافة المخلوقين نزعت منه هيبة الطاعة، فلو أمر ولده أو بعض مواليه لاستخف به

"যে ব্যক্তি মাখলুকের ভয়ে আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার ছেড়ে দেয়, আল্লাহ তাআলা তার প্রভাবকে (মাখলুকের অন্তর থেকে) খতম করে দেবেন। তখন সে তার ছেলে বা গোলামকেও কোনো বিষয়ের নির্দেশ দিলে তারা গুরুত্ব দেবে না।"

عن أبي هريرة، قال: قلنا: يا رسول الله، إن لم نأمر بالمعروف ولم ننه عن المنكر، حتى لا ندع شيئا من المعروف إلا عملنا به، ولا شيئا من المنكر إلا تركناه، لا نأمر بمعروف ولا ننهى عن منكر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به كله، وانهوا عن المنكر وإن لم تناهوا عنه كله

হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, আমরা আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি নিজেরা আমল করা পর্যন্ত অন্যকে ভাল কাজের আদেশ দান করব না? এবং ঐ সময় পর্যন্ত মন্দ কাজ থেকে বাধা দান করব না, যতক্ষণ না নিজেরা সেটা থেকে বিরত থাকি? তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করলেন, "ভাল কাজের আদেশ দিতে থাকো, যদিও তোমরা না করো এবং মন্দ কাজ থেকে বাধা দাও, যদিও তোমরা নিজেরা তা থেকে পুরোপুরি বিরত না থাক।"

এ কাজের গুরুত্ব, তার ফাযায়েল এবং তা ত্যাগ করার শাস্তি আলোচনা করার উদ্দেশ্য হলো, সমাজকে মঙ্গল ও কল্যাণের ওপর রাখা এবং অকল্যাণ ও অনিষ্ট থেকে দূরে রাখা। وتواصوا بالحق এর আমল জারি রাখা খুব জরুরি। যে সমাজে এ আমল চালু থাকবে, সে সমাজ আমালে সালেহা বা উত্তম আমলের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। পক্ষান্তরে কোনো সমাজ থেকে যদি এ আমল ওঠে যায়, সে সমাজ যতই ভালো হোক না কেন, দেখতে দেখতে এক সময়

সে সমাজে পাপাচার ও অকল্যাণ ছড়িয়ে পড়বে। সমাজের কারো মাঝে এর অনুভূতিটুকুও থাকবে না। এ আমলের গুরুত্ব অনুধাবন করার জন্য ঐ সমাজ ও তার পবিত্র সদস্যদের আমলের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে, যাঁদের মাঝে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. একে অপরের সাথে মিলিত হলে বিদায় নেওয়ার পূর্বে একে অপরের সামনে সূরা আসর তিলাওয়াত করতেন।

হক্কানী উলামায়ে কেরাম ও وتواصوا بالحق

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস যেগুলো হক্ব বলা এবং হক্বকে লুকানোর ব্যাপারে এসেছে, এগুলোই উলামায়ে হক্কানীর ঘুম হারাম করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। বিশেষ করে, বর্তমান প্রেক্ষাপটে যেহেতু অডিও-ভিডিও ভাষণের জয়জয়কার চলছে এবং দ্বীনের নামে বিচিত্র রকমের কথা বলে হক্বকে বাতিল, কুফরকে ইসলাম আর ইসলামকে ইসলামের বাহিরের প্রমাণ করার অপপ্রয়াস চলছে।

প্রভাবশালীগোষ্ঠী তাদের পদলেহী সরকারি মোল্লাদের মাধ্যমে তাদের প্রবৃত্তি ও ইচ্ছাকে ইসলাম প্রমাণ করার চেষ্টায় লিপ্ত। এহেন পরিস্থিতিতে হক্কানী উলামায়ে কেরামের ওপর ফরয হলো- তারা দ্বীনকে তার মূল অবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখবেন। শরয়ী পরিভাষা, তার সঠিক অর্থ ও ব্যাখ্যাকে হেফাজত করবেন। কুফর ও ইসলামের সীমারেখা রক্ষা করবেন। তার জন্য যদিও আসলাফ ও আকাবিরদের পদ্ধতি তথা শাসকগোষ্ঠীর আক্রোশ, জেলজুলুম,

দেশান্তর এবং ফাঁসি বরণ করে নিতে হয়। এটাই তো সত্যিকারের উলামাদের উত্তরাধিকার। উত্তরসূরিরা তো ওরাই হয়- যারা উত্তরাধিকার অর্জন করে নেয়।

কুফরী নেযাম ও ব্যবস্থাপনার প্রতি আপনি দৃষ্টি মেললে দেখবেন, তারা কতটা পাবন্দি ও ধারাবাহিকতার সাথে কুফরী ও পাপাচারের প্রচার-প্রসার করে যাচ্ছে। মিডিয়ার মাধ্যমে দিনরাত মেহনত করে যাচ্ছে তারা। তাদের মেহনতের উদ্দেশ্য একটাই- অপব্যাখ্যা ও মিথ্যাচারের মাধ্যমে কুফর ও ইসলামকে গোঁজামিল করে দেওয়া; যাতে সাধারণ মুসলমান তো বটেই, বিশেষ মুসলমানরাও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। এসব দেখতে দেখতে সমাজে এমন সব পাপাচার ছড়িয়ে পড়ে, কয়েক বছর পূর্বে যার কল্পনাও করা যেত না। এমনকি দ্বীনদার শ্রেণীরাও এমন এমন পাপাচারে জড়িয়ে পড়ে, যার কল্পনা করাও ধার্মিক পরিবারে পাপ মনে করা হতো। সবচেয়ে দুঃখের কথা হলো, এ পাপগুলোকে পাপ মনে করার অনুভূতিটুকুই বের হয়ে যাচ্ছে মানুষের অন্তর থেকে।

এভাবে কোনো ভাল কাজ থেকে বাধা দেওয়ার প্রক্রিয়া চালানো হলে তার প্রভাবও সমাজের ওপর পড়ে। ফলে সমাজ এ ভাল কাজকে ভাল মনে করা সত্ত্বেও তা থেকে বিরত থাকতে শুরু করে। তারপর এমন একটা সময় আসে, যখন ঐ কাজটা করতে সমাজের সামনে লজ্জা অনুভব করতে শুরু করে।

বর্তমান নতুন সমাজব্যবস্থার প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি মেললে স্পষ্টভাবে বুঝে আসে যে, মানুষ কিন্তু জন্মগতভাবে খুব একটা খারাপ নয়, কিন্তু সমাজ ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের কারণে সে

মন্দ হতে বাধ্য হয়ে যায়। অথবা সে খারাপ তো হয় না, কিন্তু নিজেকে সমাজের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য খারাপ সাজার চেষ্টা করে।

বুঝা গেল وتواصوا بالحق এর আমল সমাজের পরিবর্তন সাধন ও সংশোধনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই যদি দ্বীনের দায়ীগণ সমাজকে সংশোধন করতে চান; তাহলে তাদেরকে প্রতিটা ক্ষেত্রে وتواصوا بالحق এর আমলকে খুব জোরালোভাবে চালু করতে হবে। বরং তার উপরের স্তরের দাওয়াত তথা বলপূর্বক দাওয়াতের সাথে মিলিয়ে দাওয়াতকে জোরালো ও মজবুত করার দিকে ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হতে হবে। যে যতটুকু শক্তি ব্যয় করে এ আমল করার সামর্থ্য রাখে, তাকে ততটুকুই করা চাই। আল্লাহর হুকুম পালনে নির্দেশ দিতে কাউকে ভয় করা উচিত নয়। আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয় থেকে নিষেধ করতে কাউকে পরোয়া করা যাবে না। এ আমল ব্যক্তিগতভাবেও করতে হবে। পারিবারিক, গ্রামভিত্তিক, গোত্রভিত্তিক এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রীয়ভাবেও করা চাই। এতে যে যতটুকু অংশ নেবে, সে ততটুকুই ক্ষতি ও অনিষ্ট থেকে বাঁচতে পারবে এবং ততটুকুই ফায়দা অর্জন করতে পারবে। কারণ প্রবহমান সময়ের স্রাােত হয়তো ক্ষতির বোঝা ভারী করে চলছে, নয়তো লাভের স্টক সমৃদ্ধ করে যাচ্ছে।

﴿ وتواصوا بالصبر ﴾

ইমাম ওয়াহিদী রহ. বলেন-

﴿وتواصوا بالصبر﴾ على طاعة الله والجهاد في سبيله

‘তারা আল্লাহর আনুগত্য এবং জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ’র ওপর অবিচল থাকার জোর দেয়।’

ইমাম রাযী রহ. বলেন-

والتواصي بالصبر يدخل فيه حمل النفس على مشقة التكليف في القيام بما يجب، وفي اجتنابهم ما يحرم إذ الإقدام على المكروه، والإحجام عن المراد كلاهما شاق شديد

‘আবশ্যক বিষয়াবলি আদায় করার মধ্যে যা কষ্টকর, তা সহ্য করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করাও وتواصوا بالصبر এর অন্তর্ভুক্ত। এবং হারাম বিষয়াবলি থেকে বেঁচে থাকাও। কারণ, যে কাজ করতে মন চায় না, তা করা এবং যা মন চায়, তা বর্জন করা- উভয়টাই কঠিন ব্যাপার।’

ইসলামী পুনর্জাগরণের জন্য وتواصوا بالصبر এর গর্জনের মাধ্যমে সমাজে এক আওয়াজ তোলা কোনো নতুন কথা নয়। সত্যের স্লোগানে স্লোগানে হৃদয়গুলোকে উষ্ণ করে, যুবসমাজের বুকে চেতনার আগুন জ্বালিয়ে দেওয়াও কোনো কঠিন ব্যাপার নয়। সেই জাগরণে শামিল একটি বড় অংশকে সংঘবদ্ধ করাও সাধারণ ব্যাপার মাত্র! وتواصوا بالصبر এর আহ্বানে অলি-গলি, হাট-বাজার ও সাধারণ-বিশেষের সব মিলনমেলাই মুখরিত হয়।

এসব কিছু হয় প্রাথমিক স্তরে; তবে পরীক্ষার স্তর এরপরেই শুরু হয়, যখন বিরোধী জীবনব্যবস্থা গতিশীল হয়। স্বীয় রাজত্ব-কর্তৃত্ব, সর্দারি-নেতৃত্ব, স্বীয় মতবাদ ও বিশ্বাস এবং

স্বীয় হস্তে খোদিত প্রবৃত্তির বানানো প্রভুদের রক্ষা করতে বিরোধী শিবির তখন শক্তি প্রয়োগ করতে শুরু করে।

ক্ষমতার নেশায় বুঁদ ও শক্তির হটকারিতায় ডুবে থাকা অভিজাতশ্রেণীর কাছে যখন দলিল ফুরিয়ে যায়, তখন তাদের বারান্দা থেকে এ আওয়াজ আসতে শুরু করে-

﴿ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴾

"তারা বলল, একে (ইবরাহীম আ.) পুড়িয়ে দাও এবং তোমাদের উপাস্যদের সাহায্য করো, যদি তোমরা কিছু করতে চাও।"

﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴾

"উত্তরে তাঁর কওম শুধু এ কথাটিই বলল, লূত পরিবারকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও। এরা তো এমন লোক যারা শুধু পাকপবিত্র সাজতে চায়।"

এবার শুরু হয় আসল পরীক্ষা। খড়কুটো বেছে নেওয়ার পালা। পার্থক্য হয়ে যায় সত্য-মিথ্যা। দ্বীনের পথে বিপদ ও পরীক্ষাসমূহের ব্যাপারে এ ধারণা রাখা ঠিক নয় যে, প্রত্যেক যুগে এটি রুখসত-আজিমত তথা ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবেই ছিল- যে তা পালন করবে, বড় সওয়াবের মালিক হবে। আর যে তা করবে না, তার ঈমানের কোনো ক্ষতি হবে না। বরং কখনো-কখনো এ বিপদ ও পরীক্ষাসমূহ দ্বীনের আবশ্যিক বিষয়ও হতে পারে। এটি যুগ-যুগান্তরে চলে আসা আল্লাহর এক অমোঘ বিধান।

﴿ الم . أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾

"আলিফ-লাম-মীম। মানুষ কি মনে করে যে, তারা একথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, আমরা বিশ্বাস করি; অথচ তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না?"

﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴾

"আমি তাদেরকেও পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের পূর্বে ছিল। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন- যারা সত্যবাদী এবং নিশ্চয়ই জেনে নেবেন মিথ্যাবাদীদেরকে।"

﴿ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ﴾

"আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন, যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং নিশ্চয়ই জেনে নেবেন যারা মুনাফিক।"

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ﴾

"নাকি তোমরা ধারণা করেছ যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এখনো প্রকাশ করেননি- তোমাদের মধ্য হতে যারা জিহাদ করেছে আর যারা ধৈর্যধারণকারী।"

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾

"নাকি তোমরা ধারণা করেছ যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ সে লোকদের অবস্থা অতিক্রম করোনি, যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে। তাদের ওপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট। আর এমনিভাবে শিহরিত হতে হয়েছে যে, নবী ও তাঁর ঈমানদার সঙ্গীগণ পর্যন্ত এ কথা বলে

ওঠেছেন, কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য? তোমরা শোনে নাও, আল্লাহর সাহায্য একান্তই নিকটবর্তী।”

সুতরাং সত্যের আহ্বায়কদের জন্য এটি আল্লাহর এক অমোঘ বিধান। তাঁদেরকেই পরীক্ষার ফাঁদে পা ফেলতে হয়। শত্রুর জেলখানা ও ফাঁসির মঞ্চ তাঁদের প্রাথমিক দীক্ষালয়। বিপদাপদের ঘূর্ণিঝড় তাদের অভিজ্ঞতার বিস্তীর্ণ মাঠ। সেসব বিপদাপদে দুঃখের সান্তনা হিসেবে নেমে আসে নতুন বিপদাপদ। আল্লাহ তাআলা বলেন-

﴿ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ ﴾

“ফলে আল্লাহ দুঃখের বদলে তোমাদেরকে দুঃখ দিলেন।”

যাতে এক দুঃখের সান্তনাস্বরূপ আরেক নতুন দুঃখ পেয়ে বসে। এ পথটিই এমন। যেখানে জখমের চিকিৎসা নতুন এক জখমের মাধ্যমে হয়ে থাকে। যাতে জখম সইতে সইতে অন্তর অবিচল হয়ে যায়।

﴿ لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُم ﴾

“যাতে তোমরা ভবিষ্যতে বেশি দুঃখ না করো। সেই জিনিসের কারণে নয়, যা তোমাদের হাতছাড়া হয়েছে। আর অন্য কোনো মুসীবতের কারণেও নয়, যা তোমাদের দেখা দিতে পারে।”

কারণ, পরীক্ষার নিয়মে এটিই চলমান। এভাবেই চলতে থাকবে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ﴾

“আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব, যে পর্যন্ত না আমি দেখে নেব (প্রকাশ করব) তোমাদের জিহাদকারীদেরকে এবং সবরকারীদেরকে এবং যতক্ষণ না আমি তোমাদের অবস্থানসমূহ যাচাই করব।”

এ আয়াত প্রত্যেক মুসলমান এবং বিশেষত প্রত্যেক মুজাহিদের জন্য শিউরে ওঠার মতো। সর্বজ্ঞানী পরওয়ারদেগার গুরুত্বসহ ঘোষণা করছেন, মুজাহিদ ও গাইরে মুজাহিদ পার্থক্য করার জন্য এবং আল্লাহর পথে অবিচল মুজাহিদ ও তা থেকে পলায়নকারীকে প্রকাশ করে দেওয়ার জন্য আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষায় নিপতিত করব। তোমাদের ওপর এমন অবস্থার সৃষ্টি করব, যাতে স্পষ্ট হয়ে যায়, তাওহীদকে স্বীকার করে নেওয়ার পর কে তা পুরোপুরি আদায় করতে পারে? জিহাদে আসার পর কে তাতে অবিচল থাকতে পারে? এমনকি নিজের প্রাণও সেই কালেমার জন্য কুরবান করে দিয়ে সফলদের দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

আল্লাহ তাআলা স্বীয় বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়াপরবশ। তাই তো সূরা মুহাম্মাদেই এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার উপায়ও বাতলে দিয়েছেন। বলেছেন-

﴿ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ . سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ﴾

“আর যাঁরা আল্লাহর পথে শহীদ হয়, আল্লাহ কখনই তাঁদের কর্ম বিনষ্ট করবেন না। তিনি তাঁদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন এবং তাঁদের অবস্থা ভাল করবেন।”

অর্থাৎ যারা এ কালেমার জন্য জান কুরবান করেছেন, যদিও তাঁরা শত্রুর হাতে নিজের প্রাণ হারিয়েছেন; তবুও তাঁদের কর্ম, তাঁদের চেষ্টা, তাঁদের জিহাদ, তাতে নিজের জান সঁপে দেওয়া মোটেও নিরর্থক নয়; বরং তা যথার্থই ফলপ্রসূ। আসল হলো- পরকালীন জীবন, যার প্রতি তাঁরা ঈমান রাখতেন, আল্লাহ তাঁদেরকে তাতে সফল করবেন। তাঁদের গন্তব্যস্থল জান্নাতে পৌঁছে দেবেন।

ইমাম ইবনে জারীর তবারী রহ. তাফসীরে তবারীতে বলেন, وَالَّذِينَ قُتِلُوا তে আমার মতে উত্তম কেরাত হলো, وَالَّذِينَ قاتلوا। ভাবার্থ হলো, যাঁরা আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করেছেন, আল্লাহ কখনো তাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করবেন না। তাদের ইহকাল-পরকালকে সাফল্যম-তি করবেন।

এভাবেই আল্লাহর পথের যোদ্ধাদের পরীক্ষা আরও সহজ করে দেওয়া হয়েছে যে, পরীক্ষার আগেই বলে দেওয়া হয়েছে- পরীক্ষায় কামিয়াব হওয়ার পদ্ধতি কী?

যে কালেমা মুখে পড়া হলো, সে কালেমার পতাকা উঁচু করার লক্ষ্যে যুদ্ধ করা, তার ওপর অবিচল থাকা; এমনকি দুই কল্যাণ- শরীয়ত বা শাহাদাত থেকে কোনো এক কল্যাণ লাভ হবে।

আল্লাহ তাআলা অঙ্গীকার করছেন, এ ধরনের মানুষকে তিনটি পুরস্কার দেওয়া হবে।

১. فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ: তিনি তাঁদের চেষ্টাগুলোকে বিনষ্ট করবেন না। যত দীর্ঘ সময় জিহাদ করতে থাকুক। প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি মুহূর্ত এবং প্রতিটি সেকে-ের বিনীময়ে আল্লাহ চিরস্থায়ী জান্নাত দান করবেন।

২. سَيَهْدِيهِمْ: স্বয়ং আল্লাহই তাঁদের পথ দেখাবেন; যাতে সত্যের পথে আল্লাহর সন্তুষ্টি মোতাবেক তাঁরা জিহাদ চালিয়ে যেতে পারেন। যত বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতি হোক না কেন, যত ফেতনার সয়লাব হোক না কেন, যত বড় বড় গাছ উপড়ে যাক না কেন, আল্লাহ তাঁদেরকে সত্যের পথে অবিচল রাখবেন।

৩. وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ: দুনিয়া-আখিরাতে তাঁদের অবস্থা ভালো করে দেবেন।

আর জানা কথা হলো, জিহাদ ও মুজাহিদদের অবস্থা ভালো হওয়ার অর্থ হচ্ছে, তাঁদের জিহাদ আল্লাহর দ্বীনকে উঁচু করার জন্য, নবী কারীম ﷺ এর বাতলানো পদ্ধতি মতে হবে। জয়-পরাজয় যদিও যে কোনো এক দলেরই হবে। এমনকি সব মুজাহিদ শহীদ হয়ে গেলেও তাঁরা সফলকাম, যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং নবী ﷺ এর পদ্ধতি মতে তাঁদের জিহাদ হয়ে থাকে। তবে যদি মুজাহিদীন বিজয়ের পর বিজয় লাভ করতে থাকেন, কিন্তু নিজেদের হাতেই তারা শরীয়াহ আইনকে পদদলিত করেন, কালেমার পতাকা বুলন্দ করার পরিবর্তে জাতীয়তাবাদ, দেশত্ববোধ, দলপ্রীতি বা অন্য কোনো সাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে যুদ্ধ করেন, তখন এটি তাদের অবস্থা ভালো হয়েছে বলা যাবে না। বরং এটি সবচেয়ে খারাপ অবস্থা, যেটি থেকে প্রত্যেক মুসলমানের পানাহ চাওয়া উচিত।

উম্মাহর অবস্থা ভালো করার সূক্ষ্ম এক রহস্য

এ আয়াত থেকে জানতে পারি যে, কিতালের মহান কাজ চালু রাখাই এ উম্মাহকে সব ধরনের ফেতনা থেকে বাঁচানোর মাধ্যম। কিতাল ফী সাবীলিল্লাহ আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ নির্দেশনা এবং তাঁর সন্তুষ্টি ও মুসলমানদের সামাজিক অবস্থা শুদ্ধ করার মাধ্যম। যখনই এ উম্মাহ কিতাল ফী সাবীলিল্লাহ'র আমলকে ছেড়ে বসবে, তখনই তাদের অধঃপতন শুরু হবে। তারা যুদ্ধে হেরে বসবে। নেতৃত্ব তাদের হাত থেকে বেরিয়ে শরীয়াহ'র দুশমন (কাফের, মুরতাদ ও মুনাফিক) এর হাতে চলে যাবে।

তাইতো মনে হচ্ছে, বাতিলশক্তিও এ রহস্য ভালোভাবেই জানে। তাই তারা সর্বপ্রথম শর্ত দেয় যে, আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা যাবে না। যুদ্ধ বন্ধ করে অস্ত্রসমর্পণ করতে হবে। তারা জানে, তারপর মুসলমানদেরকে ষড়যন্ত্রের জালে ফাঁসানো একদম সহজ।

একটি প্রশ্ন

যেমনটি আপনি বলছিলেন যে, এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা কিতালকারীদের সম্পর্কে অঙ্গীকার করছেন যে, তিনি তাঁদের পথপ্রদর্শন করবেন এবং তাঁদের অবস্থা ভালো করে দেবেন, তো অনেক মুজাহিদ বা বিভিন্ন জিহাদী দল সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হয় কেন?

এ প্রশ্নের জবাব স্বয়ং আয়াতেই বিদ্যমান। আল্লাহ তাআলা মুজাহিদদের দিকনির্দেশনা ও তাঁদের অবস্থা ভালো করে দেওয়ার যে অঙ্গীকার করেছেন, তাতে একটি শর্ত আছে। তা

হলো, وَالَّذِينَ قاتلوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ অর্থাৎ, যাঁরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে। আর আল্লাহর দৃষ্টিতে কিতাল ফী সাবীলিল্লাহ হিসেবে তাই গ্রহণযোগ্য হবে, যা আল্লাহর রাসূল ﷺ বর্ণনা করেছেন।

عن أبي موسى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا، ويقاتل حمية، فرفع إليه رأسه، قال: وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما، فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله عز وجل

হযরত আবু মূসা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার অর্থ কী? কারণ, আমাদের অনেকেই ক্রোধান্বিত হয়ে যুদ্ধ করে। অনেকে গোত্রপ্রীতির কারণে যুদ্ধ করে।" তখন রাসূল ﷺ মাথা উত্তোলন করলেন। মাথা উত্তোলন করার কারণ হলো, লোকটি দাঁড়ানো ছিল। অতঃপর তিনি বললেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থার বিজয়ের লক্ষ্যে যুদ্ধ করে সেই আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে।"

সুতরাং যদি কোনো মুজাহিদ ব্যক্তিগত মতামত বা কোনো জিহাদী জামাআতের সংঘবদ্ধ মতামতের কারণে সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়, জিহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, অথবা আল্লাহর অসন্তুষ্টিতে লিপ্ত হয় এবং তাদের অধঃপতন হতে থাকে, তখন বুঝতে হবে, وَالَّذِينَ قاتلوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ কিতাল ফী সাবীলিল্লাহর কাজে আল্লাহর অসন্তুষ্টিমূলক কোনো কাজ হচ্ছে। জিহাদের উদ্দেশ্য পরিবর্তিত হয়ে গেছে। দ্বীনের বিজয় ও আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিবর্তে পার্থিব উপকারিতা ও সাম্প্রদায়িকতাই সেই জায়গা দখলে নেয়। এটি সংঘবদ্ধভাবে শরীয়াহর

অনুসরণে দুর্বলতা মনে করা হয়। অথবা কোনো মুজাহিদ ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর অসন্তুষ্টিমূলক কাজে লিপ্ত হচ্ছে। কারণ, মুজাহিদের কাজ জিহাদে অবিচলতা ও দুর্বলতার কারণ হয়।

হযরত আবু দারদা রযি. বলেন-

إنما يقاتلون بأعمالكم

"তোমরা নিজেদের কাজের ওপর ভর করেই যুদ্ধ করে থাক।"

قوله: (إنما يقاتلون بأعمالكم) أي إن الأعمال الصالحة تورث ثبات القدم عند القتال. فالقتال يكون بسبب بركة الأعمال. فهي دخيلة فيه.

অর্থাৎ, সৎকাজ যুদ্ধাবস্থায় দৃঢ়তা দান করে। সুতরাং সৎকাজের কল্যাণেই যুদ্ধ হয়। তাই যুদ্ধে সৎকাজের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

আল্লাহর তাআলার তাওফীকের স্বল্পতা ও মুজাহিদদের অবস্থার অধঃপতন যতই হবে, ততই বুঝতে হবে যে, এ পরিমাণ যুদ্ধের কাজে অথবা ব্যক্তিগতভাবে কোথাও শরীয়াহবিরোধী বা আল্লাহর অসন্তুষ্টিমূলক কোনো কাজ হচ্ছে। অথবা সেটিকে এভাবে বলতে পারেন যে, কিতালের মহান কাজকে যত ইখলাসের সাথে এবং নবীজীর সুন্নাহ মতে করা যাবে, আল্লাহর তাওফীক, মুজাহিদীন ও জিহাদী দলের অবস্থা ততই ভালো থাকবে। তেমনি মুজাহিদ এর সম্পর্ক আপন পালনকর্তার সাথে যত সুদৃঢ় হবে, তাঁর তাওফীক ও পথনির্দেশনাও ততই

তাদের সাথে থাকবে। এমন কি আকণ্ঠ নিমজ্জিত ফেতনাকালেও তাদের অন্তর সত্যপথে অটুট থাকবে। এটি মুজাহিদদের জন্য রিজার্ভ।

সুতরাং وتواصوا بالحق এর ওপর আমলের পর অশুভ শক্তিগুলো কলকাঠি নাড়া শুরু করে। কারণ হক্ক-বাতিল ও ভালো-মন্দের এ যুদ্ধে বাতিল সর্বদা প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে যে, তারা হক্কপন্থীদের দাবিয়ে রাখবে, তাঁদেরকে দ্বীনের সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করবে। এবং তাঁদের দাওয়াতী কার্যক্রমকে গলা টিপে হত্যা করার জন্য তারা সব ধরনের জুলুম-নির্যাতন করাকেও বৈধ মনে করছে। তাতে না তারা কোনো শিষ্টাচার অবশিষ্ট রেখেছে, আর না কোনো সম্পর্ক বা আত্মীয়তার ধার ধারে। যেমনটি করছে পাকিস্তান আর্মি শরীয়াহ আইন চালুর দাবিকারীদের প্রতি।

কারণ, এটি এমন এক যুদ্ধ; যাতে হক্কের কাছে শুধু দ্বীন ও আকীদা এবং বাতিলের কাছে প্রবৃত্তি ও ক্ষমতাই অভিষ্ট লক্ষ্য হয়। সত্যবাদীরা হক্কের জন্য এবং প্রবৃত্তিপূজারিরা স্বীয় প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা বাঁচানোর জন্য পরস্পর মুখোমুখি অবস্থানে আছে।

সত্যবাদীদের ওপর জালিমের এ জুলুম-নির্যাতনের উদ্দেশ্য শুধু এই নয় যে, সত্যের পথে আহ্বানকারীদের অস্তিত্ব মুছে যাক; বরং ধূর্ত শত্রুদের প্রথম প্রয়াস হলো, দাওয়াতের উদীয়মান দলটিকে তাদের দাওয়াত ও নীতি থেকে সরিয়ে দেওয়া। তারা জানে, সবাইকে হত্যা করার চেয়ে অধিক কল্যাণকর হলো, তাঁদের নীতি ও পদ্ধতিতে বিকৃতি সাধন করা। তাঁরা যে স্লোগান নিয়ে বেরিয়েছে যে কোনো উপায়ে তাঁদেরকে তা থেকে হটিয়ে দেওয়া। কারণ, সবাইকে হত্যা করলে সেই নীতি ও পদ্ধতি নিঃশেষ হয়ে যায় না; বরং আগের চেয়ে

আরও বেশি প্রসারতা লাভ করে। পক্ষান্তরে তাঁদেরকে নীতি ও পদ্ধতি থেকে সরিয়ে দেওয়া গেলে পরবর্তী প্রজন্ম বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তাঁদের চিন্তা-চেতনার অপমৃত্যু ঘটে। সুতরাং এমন দল যতই ছড়িয়ে পড়–ক না কেন, শত্রুদের জন্য কোনো আশঙ্কা থাকে না। বরং তার অস্তিত্বই উপকারী হয়ে ওঠে। সেই দলের করুণ অবস্থা দেখে কেউ ওঠে দাঁড়ানোর সাহস পায় না। তাছাড়া জাগরণের কর্মী-সমর্থকরাও আগামী দিনে এমন ভুলে জড়াবে না। কারণ, এত কোরবানির ফলাফল কী এল? কিছু সরকারি পদ, দায়িত্ব ও চেয়ার! বরং কেউ কেউ তো নিজের জান বাঁচাতে নিজেদের স্লোগান থেকে সরে আসছে।

এ সত্যের আহ্বানকে দাবিয়ে রাখতে সরকার শক্তি প্রয়োগ করে। অথচ তখন সত্যবাদীরা প্রাণ হাতে নিয়েই কাজ করে। প্রাণ বিলিয়ে দিয়েই তাঁরা তাঁদের কাজ, মিশন ও স্লোগানের সত্যতা প্রমাণ করে দেখায়।

তাই আহলে হক্বকে পরীক্ষার এ স্তরে সবরের শক্তিতে বলিয়ান হতে হবে। একে অপরকে এসব পরীক্ষায় অবিচলতা, ধৈর্য, আত্মবিশ্বাস উঁচু রাখার জোর দিতে হবে। এটিই যে কোনো জাগরণের কা-ারীদেরকে পরীক্ষার সেই বিক্ষিপ্ত মুহূর্তে জমিয়ে রাখার মূলসূত্র।

হযরত লুকমান হাকীম স্বীয় পুত্রকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন-

﴿ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾

“সৎকাজে আদেশ দাও, মন্দকাজে নিষেধ কর এবং বিপদাপদে সবর কর। নিশ্চয় এটা সাহসিকতার কাজ।”

আল্লাহ তাআলা স্বীয় হাবীব ﷺ কে কতই না আদুরে ভাষায় সবরের কথা বলেছেন-

﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾

“অতএব, আপনি সবর করুন, যেমন উচ্চ সাহসী পয়গম্বরগণ সবর করেছেন।”

﴿ يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ - قُمْ فَأَنْذِرْ - وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ - وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ - وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ - وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ - وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴾

“হে চাদরাবৃত! উঠুন, সতর্ক করুন, আপন পালনকর্তার মাহাত্ম্য ঘোষণা করুন, আপন পোশাক পবিত্র করুন এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন। আর অধিক প্রতিদানের আশায় অন্যকে কিছু দেবেন না। এবং আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সবর করুন।”

হক্ব ও সত্যের দাওয়াতে অটলতা, অবিচলতা ও হাসিমুখে সব সহ্য করার ক্ষমতাই আহলে হক্বকে সফলতার মুখ দেখায়। জালিমের হিংস্রতা, হত্যা-লুণ্ঠন ও রক্তপ্রবাহের কাজ চলছেই অবিরত। জেল আবাদ হয়ে যায়। রিমান্ড মঞ্জুর হয়ে যায়। কারাগারগুলোতে জালিমের হিংস্র স্লোগান গর্জে ওঠে। কিন্তু আহলে হক্বরা, উঁচু সাহসিকতার সাথে সবরের তালকীন দিয়ে একে অপরের হৃদয়ে উষ্ণতা ছড়ায়। ফাঁসির মঞ্চে যায়। ফাঁসির রশি গলায় নিয়েও তাদের মুখে উচ্চারিত হয় নারায়ে তাকবীর! শরীয়ত নয়তো শাহাদাত। আর এতেই যুদ্ধ থাকে চলমান।

আল-হামদুলিল্লাহ! আজকের দিনেও আল্লাহ তাআলা এমন সব তরুণ সৃষ্টি করেছেন, যাঁরা আল্লাহ দ্বীনের জন্য, মুহাম্মাদ ﷺ এর আনীত ধর্মের বাস্তবায়নে পৃথিবীজুড়ে নিজেদের পূর্বপুরুষদের স্মৃতিকে নবায়ন করছেন। তাঁরা কারাবরণ করেছেন। কারাগারের দৃশ্যই তাঁরা পাল্টে দিয়েছেন। কারাগার থেকে মুক্তি মিললে পুনরায় তাঁরা সেই মিশনে যোগ দেন। দ্রোহের

আগুন নিভেনি। মুহাম্মাদ ﷺ এর শরীয়তের জন্য কুরবান হওয়ার আকাঙ্ক্ষা শেষ হয়ে যায়নি। তাঁরা কাঠগড়ায় দাঁড়ালে বিচারক পর্যন্ত কেঁপে ওঠে। ঢাকঢোল পিটিয়ে ফাঁসি ঘোষণাকারীরাই চুপিচুপি তাঁদেরকে ফাঁসি দিচ্ছে।

আজকের পাকিস্তানে হক্কানী উলামায়ে কেরাম ও শরীয়তের স্লোগানধারী পাগলদের ওপর যে অত্যাচার চালানো হয়েছে, তা গুয়েনতানামো বে'র অত্যাচারকেও হার মানিয়েছে।

বিশেষত, ইসলামের নামে প্রতিষ্ঠিত এ পাকিস্তানে হক নেওয়াজ জঙ্গভী শহীদ রহ., ডাক্তার হাবীবুল্লাহ মুখতার শহীদ রহ. থেকে নিয়ে গাজী আব্দুর রশীদ শহীদ রহ. এবং মুফতী আব্দুল মাজীদ দীনপুরী শহীদ রহ. পর্যন্ত যত উলামায়ে কেরাম শহীদ হয়েছেন, সবার একটাই অপরাধ- তাঁরা পাকিস্তানে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম বাস্তবায়নের জন্য চেষ্টা করেছেন।

পাকিস্তানের গোপন এজেন্সিগুলোর টর্চারসেলে যে অত্যাচার মুজাহিদদের ওপর চালানো হয়েছে, তার দৃষ্টান্ত গুয়েনতানামো ও বাগরামেও খুঁজে পাওয়া যায় না।

এত জুলুম-নির্যাতন সত্ত্বেও এই স্তরে সেসব পাগলদের বিজয়ই দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হচ্ছে। সরকারের কাছে সব ধরনের শক্তি ও অস্ত্র থাকার পরও তাঁদেরকে এ পথের দাওয়াত দেওয়া থেকে বিরত রাখতে পারেনি।

নেতৃত্ব পরীক্ষার অগ্নিচুল্লির মাঝে

বাতিল ও ভ্রান্ত আন্দোলনের মতো হক্বপন্থীদের আন্দোলনে এমন হয় না যে, ত্যাগ ও কুরবানির জন্য শুধু কর্মীদেরকেই সামনে বাড়ানো হয় এবং নেতৃবৃন্দ ও তাদের সন্তানেরা বিলাসিতা ও আরাম আয়েশে মত্ত থাকে। এমনকি একসময় এ নেতৃত্ব ও তাদের সন্তানেরা বিলাসিতার এ নোংরামিতে ঢুকে নিজেরাই জুলুমকারীর অংশে পরিণত হয়ে যায়; যে জুলুমের বিরুদ্ধে তারা আন্দোলনের স্লোগান তুলেছিল। বরং আহলে হক্বের আন্দোলনে কর্মীদের পূর্বে নেতাদেরকেই পরীক্ষার অগ্নিচুল্লিতে যাচাই করা হয়। আল্লাহ তাআলা প্রথমে নবীগণকে পরীক্ষার সম্মুখীন করেছেন, তারপর তাঁদের অনুসারীদের পালা এসেছে।

হযরত ইবরাহীম আ. কে কত কঠিন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এভাবে আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় হাবীব ﷺ কে সব ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন করেছেন, তাঁর মেয়েদেরকে, তাঁর পরিবারকে এবং তাঁর জামাতা ও নাতিদেরকে কঠিন পরীক্ষার এ স্তর অতিক্রম করতে হয়েছে।

সর্ব সম্মতিক্রমে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.কে প্রথম খলীফা নিযুক্ত করা হয়েছিল। এর কারণ কী ছিল? কে ছিলেন তিনি? তাঁর কী অবদান ছিল? ইসলামের পরিচর্যা ও আল্লাহর রাসূল ﷺ এর জন্য কুরবান ও উৎসর্জনে তাঁর অবস্থান কী ছিল? সকল আরববাসী এ মহান ব্যক্তিত্ব, তাঁর যোগ্যতা, তাঁর ত্যাগ এবং নেতৃত্বের অধিকারকে খুব ভালভাবে জানত। একইভাবে দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাযি. কে ছিলেন? ইসলাম এবং মুসলমানরা তাঁর থেকে কী উপকার লাভ করেছে? আল্লাহর রাসূল ﷺ এর সাথে তিনি

কীভাবে সময় কাটিয়েছেন? আরবের মরুভূমি ও পাহাড় এ সাধক বীরপুরুষকে খুব ভালভাবেই চিনত। এভাবে দ্বীনের জন্য হযরত উসমান রাযি. ও হযরত আলী রাযি. এর কুরবানির ব্যাপারে আপন-পর সকলেই অবগত ছিলেন।

এ নিয়মটাই আল্লাহ তাআলা হক্কপন্থীদের সাথে আজ পর্যন্ত জারি রেখেছেন। আন্তর্জাতিক কুফরী ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো জিহাদী সংগঠনের নেতৃবৃন্দই সর্বপ্রথম কুরবানি দিয়েছেন। নিজেদের ঘরবাড়ি, ধনসম্পদ এবং আরাম-আয়েশ উম্মাহর ভবিষ্যতের জন্য কুরবানি করে দিয়েছেন। এ পথে নিজেদের সন্তানদেরকে চোখদেখা মৃত্যুর মুখে পতিত করেছেন এবং উম্মাহর জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছেন।

আমীরুল মুমিনীন মোল্লা উমর মুজাহিদ রহ. কুরবানির এমন এক ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন, যার ওপর ইসলামী জাগরণের আন্দোলন আজীবন গর্ব করতে পারবে। হক্কানী উলামায়ে কেরাম কাফেরগোষ্ঠীর সামনে বুক ফুলিয়ে এ মহান ব্যক্তিত্বকে নিজেদের নেতা হিসেবে পরিচয় দিয়ে বলতে পারেন, ইনি মুমিনদের নেতা। আল্লাহ এ মর্দে মুজাহিদকে উম্মাহর পক্ষ থেকে উত্তম বদলা দান করুন। তিনি আপন সত্তা ও সন্তান-সন্ততির কুরবানি, ক্ষমতা ও নেতৃত্বের কুরবানি দিয়েছেন। একইভাবে তাঁর সহযোদ্ধাগণও নিজের জান-মাল, সন্তান-সন্ততি এবং নিজ জাতি ও গোষ্ঠীর কুরবানি দিয়েছেন। মুজাদ্দিদে জিহাদ শায়খ উসামা ইবনে লাদেন রহ. সর্বপ্রথম নিজের জানমাল, ঘরবাড়ির কুরবানি দিয়েছেন। নিজের সন্তানদেরকে এ রাস্তায় উৎসর্গ করেছেন। তাঁর মেয়েগণ বিধবা-জীবন বরণ করে নিয়েছেন। এভাবে শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফি. নিজের যৌবন কাটিয়েছেন বন্দীশালার কষ্ট এবং হিজরত, দেশান্তর ও

যুদ্ধের কষ্টের মাধ্যমে। তাঁর জীবনসঙ্গিনী আল্লাহর রাহে এমনভাবে শহীদ হয়েছেন যে, কবরে মাটি দেওয়াও সম্ভব হয়নি। তাঁর সাথে শায়খের ছেলেও ইসলাম ও উম্মাহর তরে কুরবান হয়ে যান। তারপর তাঁর মেয়েগণ, নাতি-নাতনিগণ বছরের পর বছর বন্দীজীবনের নির্মম কষ্ট-যাতনার মধ্যে দিন কাটিয়েছেন। দীর্ঘদিন পর্যন্ত আকাশ দেখারও তাঁদের নসীব হয়নি। তারপর দুই মেয়ের প্রেমময় স্বামী আল্লাহর পথে শাহাদাত বরণ করেন।

হিজরত, বিচ্ছেদ, দেশান্তর, জেলজুলুম এবং শাহাদাত... এ ধরনের মর্যাদা আল-হামদুলিল্লাহ ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান ও আন্তর্জাতিক জিহাদী সম্প্রদায়ের নেতাগণ অর্জন করেছেন। এ স্পষ্ট দ্বীনের জন্য, উম্মাহর সম্মান ও ইজ্জাহ এর জন্য তাঁরা নিজেদের সবকিছু উৎসর্গ করেছেন এবং এখনো করে যাচ্ছেন। মনে রাখতে হবে, আহলে হক্কের নেতৃবৃন্দ কৃত্রিম আন্দোলন, দাজ্জালী মিডিয়ার প্রচার-প্রসার ও পূর্বসূরিদের উত্তরাধিকার থেকে নেতৃত্ব লাভ করেন না, তারা তো যুদ্ধের বিকট চিৎকার ও চেঁচামেচির মধ্যে পাখা মেলেন। হিজরত তাঁদেরকে এ পৃথিবীর প্রতি অশ্রদ্ধা শিক্ষা দেয়। আগত দিনগুলোর শাহাদাত তাঁদেরকে নশ্বর দেহের বাস্তবতা উপলব্ধি করায়। বন্দীশালা তাঁদেরকে জীবনযাপনের পদ্ধতি শেখায়। ড্রোন থেকে নিক্ষিপ্ত মিসাইল তাঁদের সাহসিকতার জুতোয় ফিতা বেঁধে দেয়। সব সময় মৃত্যুর ছায়া তাঁদের প্রবৃত্তি ও চাহিদা পরিষ্কার করার কাজ দেয়, যা তাঁদেরকে বর্তমান অবস্থাকে কুরবান করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে; যাতে তাঁরা নিজেদের ভবিষ্যৎ (পরকাল) সজ্জিত ও সমৃদ্ধ করতে পারেন।

গণতন্ত্রবাদীদের মতো আহলে হক্কের নেতৃত্বে কোনো আসন নয়; বরং ছাপ্পড় খাট বা কাঁটায় সাজানো বিছানা হয়ে থাকে, যার ওপর ঘুমালেও মানুষ আরাম পায় না। এটি চিন্তা ও টেনশনের এমন এক বোঝা, যা পাহাড়ের ওপরও যদি তুলে দেওয়া হয়; তাহলে এত কঠিন কষ্ট সইতে না পেরে তাও কালো হয়ে যাবে। তাঁরা নেতৃত্বের দোহাই দিয়ে আলীশান প্রাসাদ বানান না; বরং নিজেদের ঘরবাড়িকে জীর্ণশীর্ণ করে উম্মাহর দ্বীন, আকীদা, ঈমান ও ঘরবাড়ির হেফাজত করেন। আল্লাহর শাসনব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত এ উজাড় অনাবাদি জমিনকে নিজেদের তপ্ত খুন দ্বারা সিক্ত করেন; যাতে তার ওপর শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা করে তাকে আবাদের যোগ্য করে তোলা যায়। তাদের এ আবাদ করার সাথে মিশে আছে তাঁদের হা হুতাশ ও শোক-চিৎকার। এ আবাদির সৌন্দর্য ও আরাম আয়েশ জারি আছে তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষার জলাঞ্জলি দিয়ে এবং তাঁদের ইচ্ছা ও চাহিদার মৃত্যু ঘটিয়ে।

হক্ক ও বাতিলের এ পার্থক্য খুব ভালভাবে বুঝতে হবে, বর্তমান যুগেও বাতিল দলসমূহের নেতা তৈরি করার প্রক্রিয়া কৃত্রিমতা ও ধোঁকার ওপর প্রতিষ্ঠিত। বাতিল শক্তি কাজ হিসেবে কর্মী খোঁজে তারপর কোনো এক কুশপুত্তলিকাকে নেতা বানিয়ে পৃথিবীর সামনে পেশ করে দেয়। আসমান-জমিনের সৃষ্টিকর্তা সাক্ষী, ইউরোপের দ্বিতীয় নবযৌবন (আসলে খৃষ্টবিশ্বের প্রাথমিক ধ্বংস) থেকে আজ পর্যন্ত বিশেষ করে উসমানী খেলাফতের পতন থেকে এ প্রতারণার মাধ্যমে পৃথিবীর সামনে এমন কর্মীদেরকে নেতা বানিয়ে পেশ করা হয়েছে, যারা অতিমাত্রায় অযোগ্য ও নিষ্কর্মা। কিন্তু প্রচারমাধ্যমের প্রতারণা এবং বর্তমান যুগের ইতিহাস বিকৃতকারীদের ধোঁকাবাজি নর্তকী, ভাঁড়, গায়ক এবং গর্হিত সমকামিতায় জড়িত

লোকদেরকেও এই জাহেলী সমাজের হিরু বানিয়ে পেশ করেছে। মূল কথা হলো, যদি স্যান্ট ভ্যালেন্টাইনের মতো অশ্লীল ও নোংরা মানসিকতাধারী লোককে নেতা, আদর্শ ও বীর হিসেবে পেশ করা যেতে পারে; তাহলে অন্যান্য নির্বোধ লোক তো তার থেকেও যোগ্য হবেই।

বাস্তবতা হলো, গণতন্ত্র একটা তামাশা যেখানে রাষ্ট্রের প্রভাবশালী শক্তি (সেনাবাহিনী ও গোপন এজেন্সিসমূহ) এ গণতান্ত্রিক জনগণকেই নেতা বানিয়ে পেশ করে এবং একের পর এককে ব্যবহার করে লাথি মারতে থাকে। সবাই জানে, প্ল্যান কোথায় তৈরি করা হয় এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিষয়াবলি সম্পর্কে পরিকল্পনা কোথায় নেওয়া হয়?

বর্তমান যুগের প্রতারণা ও ধোঁকা হলো, এ যুগের ইতিহাস সাজাচ্ছে শয়তান। প্রচারমাধ্যম, আন্তর্জাতিক বার্তাসংস্থা এ সাজানো ইতিহাস রচনার মৌলিক ভিত্তি। এজন্য তারা যাকে ইচ্ছা নায়ক বানিয়ে দেয় আর যাকে ইচ্ছা সন্ত্রাসী প্রমাণ করে। যাকে চায় পথপ্রদর্শনকারী আর যাকে চায় লুটেরা সাব্যস্ত করে। এ সবকিছুই হচ্ছে দাজ্জালী যুগের কারসাজি (?)। শুধু দেখতে থাকুন আর নিজ প্রভুর সত্যতার চাক্ষুষ প্রমাণ দেখুন, তিনি কীভাবে লোকদের মাঝে বাতিল পন্থাগুলোকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এ ধরনের পন্থা দ্বারা দ্বীনের বিজয় তো দূরের কথা, মাথার পাগড়ি বড় করা ছাড়া আর কিছুই করা যাবে না।

যাই হোক, হক্ক ও বাতিলের নেতৃবৃন্দের মাঝে এতটা স্পষ্ট পার্থক্য আছে, যেমনটা দুনিয়া ও আখিরাতের মাঝে আছে, স্বার্থত্যাগ ও স্বার্থপরতার মাঝে আছে, আলো আর অন্ধকার, জ্ঞান আর অজ্ঞতার মাঝে আছে।

তাই যে আন্দোলন স্পষ্ট দ্বীন তথা ইসলামের দাওয়াত নিয়ে গড়ে ওঠে, সেটা তার প্রবর্তকের বাতলানো তরীকা অনুযায়ী পরিচালিত হয়। সে এ পন্থাই অবলম্বন করে; যা আল্লাহর শেষ রাসূল ﷺ অবলম্বন করেছিলেন। সে এ দায়িত্বকে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত আমানত মনে করে। এটার মাধ্যমে সে আখিরাতের কামিয়াবি এবং জান্নাতের দরজাবুলন্দির প্রার্থী হয়। এজন্য সে এ পথের প্রত্যেক ত্যাগ ও কুরবানিকে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং আখিরাতের মর্যাদা বৃদ্ধির উপায় মনে করে।

وتواصوا بالحق এর পথে আগত সমস্যা সত্ত্বেও একই স্লোগান, একই দৃঢ়তা, একই লড়াই- যার ওপর আন্দোলন ও জামাআতের ভিত্তি রাখা হয়েছে এবং তারপর একই মানহায ও ফিকিরের ওপর وتواصوا بالصبر এর স্লোগান কখনো ফাঁসির কাষ্ঠ থেকে, কখনো বন্দীশালা থেকে, কখনো শাস্তির গোপন প্রকোষ্ঠ থেকে আবার কখনো তপ্ত তক্তার ওপর দাঁড়িয়ে বজ্রকণ্ঠে দিয়ে যায়। وما بدلوا تبديلا রাস্তা বদলায়নি, সহযাত্রী বদলায়নি, কাফেলা ত্যাগ করেনি, কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্নও হয়নি। এ স্তরগুলো ইসলামী আন্দোলনগুলোর জীবনে জীবন-মৃত্যু এবং সফলতা-ব্যর্থতার মারহালা বা স্তর হয়। কারণ যদি নেতৃবৃন্দ নিজের মিশনের ওপর নিজেদের জান কুরবান করে দেন; তাহলে এটা তাঁদের বিজয় হয় এবং বাতিল শাসনব্যবস্থার মুখে পরাজয়ের চুনকালি পড়ে, যা দূর করা যায় না।

এ পরীক্ষা ও বিপদে পতিত করা তো আল্লাহর সুন্নাত। আল্লাহ চাইলে তো কুফরকে এমনিতেই ধ্বংস করে দিতে পারেন। সূরা মুহাম্মাদে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

﴿ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ﴾

"এটা এজন্য যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি চান- তোমাদের একজনকে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করতে।"

কী এই পরীক্ষা?

ঈমানদারদের পরীক্ষা হলো, মুখে কালেমা পাঠ করার পর এ কালেমার সত্যতার ওপর কতটুকু একীন আছে? এবং এ কালেমার জন্য কে জানমাল উৎসর্গ করতে পারবে?

কালেমার সত্যতা ও তার বিনীময়ে আসন্ন নেয়ামতের প্রতি এমন একীন হয়ে যায় যেমনটি দুনিয়াবাসী চোখদেখা দুনিয়ার ওপর করে। তখন সে নিজের সবকিছু উৎসর্গ করতে দ্বিধা করে না। এ কালেমা কার অন্তরে কতটুকু জায়গা করে নিয়েছে?- তা দুনিয়া ও আখিরাতের প্রতি তার একীন দেখে বোঝা যায়। যে ব্যক্তি আখিরাতের ওপর এমন বিশ্বাস রাখে; যেন পলক পড়তেই সে আল্লাহর সামনে গিয়ে দাঁড়াবে, তার অর্থ হলো, তাওহীদের কালেমা তাঁর অন্তরে এমনভাবে বদ্ধমূল হয়েছে যে, এটা ছাড়া অন্য সবই তাঁর অন্তর থেকে বের হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে কেউ যদি আখিরাতের পরিবর্তে চোখদেখা পৃথিবীকে প্রাধান্য দেয়, তার নশ্বর জীবন ও মালদৌলতকে প্রাধান্য দেয়; তাহলে এটা স্পষ্ট যে, তার অন্তরে তাওহীদ কতটুকু আছে এবং অন্য বিষয় কতটুক জায়গা জুড়ে বসে আছে? আল্লাহ তাআলা সূরা তাওবার এক আয়াতে এ পুরো বিষয়টাকে খুব ভালভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছেন; যাতে উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য কোনোরূপ জটিলতা না থাকে। তিনি বলেন-

﴿ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ﴾

“যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনে, তাঁরা নিজের সম্পদ ও জীবন দ্বারা জিহাদ করা থেকে অব্যাহতি পাবার প্রার্থনা আপনার নিকট করে না। আল্লাহ মুত্তাকিদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।”

অর্থাৎ আল্লাহ ও আখিরাতের ওপর যার ঈমান আছে, সে জিহাদ থেকে অব্যাহতির অনুমতি চায় না। সে তো আল্লাহর সাথে মোলাকাত এবং কিয়ামতের দিন এ কালেমার জন্য প্রাণ-উৎসর্গকারীদের জন্য বরাদ্দ নেয়ামত পাওয়ার জন্য অস্থির থাকে।

অনুমতি তো সেই চাইবে, যার অন্তরে এ কালেমা প্রবেশই করেনি এবং সে আখিরাতের পরিবর্তে এ পৃথিবীকেই আসল মনে করে। আখিরাতের চেয়ে দুনিয়ার প্রতি তাদের একীন ও বিশ্বাস বেশি। কালেমা তো তারা এমনিতেই পড়েছে। কিছু রসম-রেওয়াজ আদায় করবে আর মুসলমানদের তালিকায় প্রবেশ করবে- কালেমা দ্বারা এটাই তাদের উদ্দেশ্য।

ইমামুল মুফাসসিরীন ইমাম ইবনে জারীর তবারী রহ. এ আয়াতের তাফসীরে খুব কঠিন ও শক্ত কথা বলেছেন-

وهذا إعلامٌ من الله نبيَّه صلى الله عليه وسلم سِيمَا المنافقين: أن من علاماتهم التي يُعرفون بها تخلُّفهم عن الجهاد في سبيل الله، باستئذانهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تركهم الخروجَ معه إذا استنفروا بالمعاذير الكاذبة

‘এটার মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল ﷺ কে মুনাফিকদের আলামতসমূহ জানিয়ে দেওয়া হলো যে, তাদের ঐ আলামতসমূহ যেগুলোর মাধ্যমে তাদেরকে চেনা যাবে, তার অন্যতম

হলো- তারা মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে আল্লাহ এবং রাসূল ﷺ থেকে জিহাদে না যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে আল্লাহর পথে জিহাদ করা থেকে পিছুটান মারবে।'

﴿إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ﴾

"আপনার থেকে তারাই (জিহাদে না যাওয়ার) অনুমতি চাইবে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে না এবং যাদের অন্তর সন্দেহের বশবর্তী হয়ে আছে। তারা তো আপন সংশয়ে দ্বিধাগ্রস্ত।"

এ কথা স্পষ্ট যে, যখন অন্তরেই সংশয় সৃষ্টি হয়েছে এবং যা কিছু হযরত মুহাম্মাদ ﷺ আনয়ন করেছেন, সে ব্যাপারেই সন্দেহে পড়ে গেছে যে, মুহাম্মাদ ﷺ এর আনীত শরীয়ত ক্ষতি থেকে বাঁচাতে পারবে, না ঐ 'শরীয়ত' যাকে আন্তর্জাতিক সুদখোরেরা বৈশ্বিক নেজাম বা ব্যবস্থাপনার নামে জাতিসংঘের মাধ্যমে চাপিয়ে দিয়েছে, তা বাঁচাতে পারবে?

সুতরাং যাদের কালেমা পড়ার ব্যাপারে আল্লাহপাক সাক্ষী দিচ্ছেন যে, তাদের ঈমান আনা ও কালেমা পাঠ করা মিথ্যা। তাদের কেবল মৌখিক কালেমা পাঠ করা তাদেরকে কতটুকু ক্ষতি থেকে বাঁচাতে পারবে?- তা অনুধাবন করা মুশকিল নয়।

নিজের দ্বীন ও ঈমানকে পরাজিত দেখেও বাতিল ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কিতাল না করা, কুফরের গোলামির জিন্দেগি গ্রহণ করে প্রাণ বাঁচিয়ে ফেরাকে কোন জাতির অভিধানে 'বিজয়' বলা হয়েছে? নিজের ঘরবাড়ি বাঁচাতে মুসলমানদের ঘরবাড়ি পুড়তে ও উজাড় হতে দেখে, জীর্ণশীর্ণ হয়ে যেতে দেখে তামাশার নিরব দর্শক হয়ে বসে থাকা কোথাকার ভদ্রতা? যখন

একদিকে আল্লাহর দল ও অপরদিকে শয়তানের দল মুখোমুখি অবস্থানে, যখন উভয় দলই নিজ নিজ আকীদা ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠা করতে নিজের সর্বস্ব বিলীন করতে প্রস্তুত। মুমিনগণ ইসলামের জন্য আর কাফেররা কুফরী নেজাম বাস্তবায়নের জন্য যুদ্ধ করছে। এ যুদ্ধে নিজেকে যুদ্ধের কাতার থেকে আলাদা করে যদি এটা মনে করা হয় যে, আমি তো নিরেপক্ষ, তখন প্রশ্ন হলো- আপনি কোন দল থেকে নিরপেক্ষ হয়েছেন? ইসলাম থেকে?- যার জন্য প্রাণ দেওয়া আপনার ওপর ফরয ছিল। রহমাতুল্লিল আলামীন ﷺ এর আনীত কুরআন থেকে?- যার জন্য ঘরবাড়ি, মালসম্পদ, সন্তানসন্ততি সবকিছু কুরবান করে দেওয়ার আদেশ আছে। আপনি তো ইসলাম থেকে শুধু এ কারণে নিরপেক্ষ অবস্থানে গেছেন; যেন কুফরী ব্যবস্থার ধারকবাহক শক্তি আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট না হয়ে পড়ে। আল্লাহর পরিপূর্ণ দ্বীনের দাওয়াত উলামায়ে কেরামের জিম্মাদারি; যদিও গোটা বিশ্ব তাঁদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যাক না কেন। বর্তমান সময়ে দ্বীনের দায়ীগণের বিশেষ করে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের মনে রাখতে হবে, إن الإنسان لفي خسر তথা সকল মানুষ ক্ষতির মধ্যে আছে, এর সেøাগান তোলার পর এ সূরার দ্বিতীয় অংশ: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر (একে অপরকে হক্ব ও ধৈর্যের উপদেশ দান)-কেও মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে। না হলে ইসলামী আন্দোলনের দুর্বল ভিত্তি, অন্তঃসারশূন্য স্লোগান বা দুর্বল ভূমিকার কারণে মানুষ ইসলামী জাগরণ সম্বন্ধেও ধোঁকা ও প্রতারণার শিকার হবে।

একবার যখন 'আমাদের প্রভু আল্লাহ' এ ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন, তখন আবশ্যক হলো এটার ওপরই অটল ও অবিচল থাকতে হবে। এটার ওপরই জীবনযাপন করতে হবে, এর ওপরই

মরতে হবে। গাইরুল্লাহ'র প্রত্যেক নেজাম থেকে বিদ্রোহের ঘোষণা দিতে হবে। কেবল মুহাম্মাদ ﷺ এর আনীত নেজাম প্রতিষ্ঠার জন্যই চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আর এর জন্যই শত্রুতা, দুশমনি, অন্ধকার কুঠরি, ফাঁসির কাষ্ঠ এবং দেশান্তর- এগুলো ক্ষতি নয়, এগুলোই হলো চূড়ান্ত সফলতা। কেননা, এসব আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই, তাঁর দ্বীনের বিজয়ের জন্যই বরণ করা হয়।

তাই দ্বীনের দায়ীগণ এবং আল্লাহর জমিনে আল্লাহর কালেমাকেই বুলন্দ করার মহান ব্রত নিয়ে জাগ্রত হওয়া লোকদের জন্য আবশ্যক হলো, এ সূরার শেষ আয়াতকে নিজের মানহায ও কর্মপদ্ধতি হিসেবে বেছে নেবে; যাতে কাফেলা সফলতার পথে চলমান থাকে।

মুসলিম উম্মাহর চিন্তাশীল শ্রেণীকেও এটা বুঝতে হবে যে, নিজেদের দাওয়াত এবং মানহায ও দৃষ্টিভঙ্গিকে বিজয়ী করার জন্য ক্ষমতাশীল শক্তির সামনে বিদ্রোহের ঘোষণা দেওয়া আম্বিয়ায়ে কেরাম আ. এর সুন্নাত। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত দ্বীনের পরিপূর্ণ দাওয়াত- কাফেরদের যতই খারাপ লাগুক, সর্বাবস্থায় তা চালু আছে। এর জন্য যখন নিজের জান, ঘরবাড়ি এবং দেশ ত্যাগ করতে হয়েছে, তখন নিঃসঙ্কোচে সেটাই করা হয়েছে। এমনকি দলের পর দল এ দাওয়াত ও মানহাযের জন্য শহীদ হয়ে গেছেন। লড়াইয়ের ময়দানে দলের পর দল শহীদ হয়ে যাওয়া ও ক্ষমতাশীল শক্তির অন্ধকার কালো প্রকোষ্ঠ থেকে তাঁদের জানাযা বের হওয়াকে পুরুষোচিত ইতিহাস পরাজয় বলে না। এতে তো তাঁদের মানহায ও মতবাদের বিজয়ই হয়। পরাজয় হলো, দলের নেতৃবৃন্দ নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য কর্মীদের কুরবানির সাথে গাদ্দারি করে নিজেদের মানহায ও মতবাদ থেকে দূরে সরে আসা।

তারা দুনিয়ার ক্ষণিকের জীবন থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য আখিরাতের স্থায়ী ও অবিনশ্বর জীবন থেকে গাফেল হয়ে যায়। বিপ্লবের ইতিহাসে শোচনীয় পরাজয় এটাকেই বলা হয় যে, নেতৃবৃন্দ নিজেদের মৌলিক মতবাদ ও চিন্তাধারা থেকে ভীত হয়ে, ক্লান্ত হয়ে সাহস হারিয়ে ফেলে বা অন্য কোনো কারণে সরে পড়ে। হক্কের কাফেলা নিজেদের স্লোগান ও মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে প্রাণ বিসর্জন দেন, এটা এমনই এক বিজয়; যার মাধ্যমে ইতিহাসের পাতা সব সময় জ্বলজ্বল করতে থাকে। যাঁরা হক্কের পথে নানা রকম কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করেছেন, কঠিন পরিস্থিতির মোকাবেলা করেছেন এবং প্রাকৃতিক ক্ষতি বরদাশত করেও এ পথে অবিচল থেকেছেন, কুরআন মজীদে আল্লাহ তাআলা এ পাগলদের ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন-

﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴾

“আর এমন কত নবী রয়েছেন, যাঁদের সঙ্গে মিলে বহু আল্লাহওয়ালা যুদ্ধ করেছেন। আল্লাহর পথে তাঁদের যে বিপর্যয় ঘটেছিল; তাতে তাঁরা হীনবল হোননি, দুর্বল হোননি এবং নত হোননি। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালবাসেন।”

ইমাম ইবনে জারীর তবারী রহ. বলেন, আহলে হেজায ও বসরার কেরাতের (তিলাওয়াতরীতি) মধ্যে এ আয়াতে قَٰتَلَ এর জায়গায় قُتِلَ পড়া হয়েছে। অর্থাৎ কত নবী ছিলেন, যাঁদের সাথে উলামা ও ফকীহগণ শহীদ হয়ে গিয়েছেন, কিন্তু তাঁদের পরবর্তীরা তাঁদের পর কিতাল করা থেকে সাহস হারায়নি এবং দুর্বলতাও প্রকাশ করেনি।

আল্লাহর দলই বিজয়ী

إلا الذين آمنوا : এক আল্লাহর জন্য হয়ে যাওয়া, তাঁর জন্য সর্বস্ব বিলিয়ে দেওয়ার অদম্য ইচ্ছা, তাঁর জন্য জীবন, তাঁর জন্য মরণ, তাঁর জন্য ভালোবাসা, তাঁর জন্য ঘৃণা, তাঁর বন্ধুদের সাথে বন্ধুত্ব, তাঁর শরীয়তের শত্রুদের সাথে শত্রুতা।

وعملوا الصالحات: আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ: ভালো ও সওয়াবের কাজে সহায়তা এবং গোনাহ ও পাপাচারে কোনো সাহায্য নয়।

وتواصوا بالحق: পৃথিবীর বুক থেকে শয়তানি বাদ-মতবাদকে বিতাড়িত করে পূর্ণাঙ্গভাবে শুধু আল্লাহর হুকুমত প্রতিষ্ঠা করার জন্য। পুরো কুরআনকে বাস্তবায়ন করার জন্য। মানবতাকে কুফরের আঁধার থেকে বের করে আখিরাতের আলোর পথে নিয়ে আসার জন্য।

وتواصوا بالصبر : অর্থাৎ পুরো দ্বীনের জন্য নবী ﷺ এর দাওয়াতে অবিচল থাকা, দ্বিখ-িত হয়ে যাওয়া, মুছে যাওয়া, বাতিলের ভয়ে ভীত হয়ে এ দাওয়াতে বেশ-কম না করা; বরং এর জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে দেওয়া।

সফলতার স্তরসমূহ

সফল ব্যক্তিগণ মর্যাদার দৃষ্টিকোণে বিভিন্ন স্তরের হয়ে থাকেন। সুতরাং কে কত সফল হয়েছেন? কে কী পরিমাণ ক্ষতি থেকে বাঁচতে পেরেছেন? স্বীয় পুঁজিকে কে কত লাভজনক করতে পেরেছেন?- কুরআনে কারীম তা-ই বর্ণনা করছে-

﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ـ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ـ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ـ﴾

“অগ্রবর্তীগণ তো অগ্রবর্তীই। তাঁরাই নৈকট্যশীল, (তাঁরা অবস্থান করবে) নেয়ামতপূর্ণ উদ্যানসমূহে।”

﴿ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴾

“আর ডান দিকের দল, কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল!”

﴿ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾

“আর যাঁরা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনসারদের মাঝে যাঁরা অগ্রবর্তী, এবং যাঁরা একনিষ্ঠভাবে তাঁদের অনুসরণ করেছেন, আল্লাহ সে সমস্ত লোকের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁরাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। আর তাঁদের জন্য তিনি প্রস্তুত রেখেছেন কাননকুঞ্জ। যার তলদেশ দিয়ে প্রস্রবণসমূহ প্রবহমান। সেখানে তাঁরা চিরকাল থাকবে। এটাই হলো মহাকৃতকার্যতা।”

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

“হে মুমিনগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দেব?- যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে।”

﴿ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

“তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবনপণ করে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম; যদি তোমরা জানতে।”

﴿ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾

“তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং তোমাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার পাদদেশে প্রস্রবণসমূহ প্রবাহিত এবং বসবাসের জান্নাতে উত্তম বাসগৃহে। এটাই মহাসাফল্য।”

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾

“নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাঁদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন এই মূল্যে যে, তাঁদের জন্য জান্নাত রয়েছে। তাঁরা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহে। অতঃপর মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেনদেনের ওপর, যা তোমরা করছ তাঁর সাথে। আর এটাই হলো মহাসাফল্য।”

﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴾

“যাঁরা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাঁদেরকে তাঁদের পালনকর্তা স্বীয় রহমতে প্রবেশ করাবেন। এটাই প্রকাশ্য সাফল্য।”

﴿ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾

“যেদিন আপনি দেখবেন, ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদেরকে, তাঁদের সম্মুখভাগে ও ডানপার্শ্বে তাঁদের জ্যোতি ছুটোছুটি করবে। বলা হবে, আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ এমন জান্নাতের, যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। তাতে তাঁরা চিরকাল থাকবে। এটাই মহাসাফল্য।”

﴿ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴾

“যেদিন কপট বিশ্বাসী পুরুষ ও কপট বিশ্বাসী নারীরা মুমিনদেরকে বলবে, তোমরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করো, আমরাও কিছু আলো নেব তোমাদের জ্যোতি থেকে। বলা হবে, তোমরা পিছনে ফিরে যাও ও আলোর খোঁজ করো। অতঃপর উভয় দলের মাঝখানে খাড়া করা হবে এমন একটি প্রাচীর, যার একটি দরজা হবে। তার অভ্যন্তরে থাকবে রহমত এবং বাহিরে থাকবে আযাব।”

﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾

“এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশমতো চলে, তিনি তাঁকে জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন, যেগুলোর তলদেশ দিয়ে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হবে। তাঁরা সেখানে চিরকাল থাকবে। আর এটাই হলো মহাসাফল্য।”

নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেন-

إن في الجنة مائة درجة، أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله، فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة - أراه - فوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة.

"নিশ্চয় জান্নাতে রয়েছে একশটি স্তর, যা আল্লাহ তাআলা তাঁর রাস্তার মুজাহিদগণের জন্য প্রস্তুত করেছেন। দুই স্তরের মাঝখানে রয়েছে আসমান-জমিনের সমান দূরত্ব। সুতরাং তোমরা যখন আল্লাহর কাছে চাইবে, তাঁর কাছে জান্নাতুল ফিরদাউস-ই চাও। কেননা, সেটি জান্নাতের মধ্যভাগে অবস্থিত এবং সবচেয়ে উঁচু। এর ওপরে দেখা যায় রহমানের আরশ। সেখান থেকেই প্রবাহিত হয় জান্নাতের ঝরনাধারা।"

মানুষের তৈরি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় লোকসানই লোকসান

ڈھونڈنے والا ستاروں کی گذرگاہوں کا

اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا

اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا

آج تک فیصلۂ نفع و ضرر کرنہ سکا

"তারকারাজির পথ-অন্বেষীরা

স্বীয় চিন্তার জগতে প্রবেশ করতে পারল না।

হিকমাহ'র বাহানায় ফেঁসেছে।

আজ পর্যন্ত নিজের লাভ-লোকসান চিহ্নিত করতে পারল না।"

কুরআনে কারীম এর এ ছোটতম সূরার ছোটতম আয়াত إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ পশ্চিমা বিজ্ঞানীসমাজ, ভারতীয় ব্রাহ্মণসমাজ এবং নব্য জাহেলী জীবনব্যবস্থা গণতন্ত্রের ধ্বজাধারীদের জন্য এখনো চ্যালেঞ্জ। হে মানবতার ধ্বজাধারীরা! যেমনি পূর্বযুগের উম্মাতেরা উন্নতি করা সত্ত্বেও আল্লাহর কিতাব ত্যাগ করার কারণে ক্ষতিতে নিপতিত, তেমনি তোমাদেরও একই অবস্থা। তোমরাও ক্ষতির গর্তে নিপতিত হচ্ছ। উন্নতির সব দাবি মিথ্যা। তোমরা পৃথিবীর বুক থেকে আল্লাহর দ্বীনকে শেষ করে দিয়ে নিজেদের গড়া ব্যবস্থা চালু করেছ। তোমরা মুহাম্মাদ ﷺ এর আনীত জীবনব্যবস্থাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিজেদের জাহেলী সভ্যতা দুনিয়ার ওপর চাপিয়ে দিয়েছ। ফলাফল কী হয়েছে?

আজ তোমরাই প্রত্যক্ষ করছ, ইউরোপ-আমেরিকার মতো উন্নত বিশ্ব একাকিত্ব, বেকারত্ব, সন্ত্রাস, নৈরাজ্য, অশান্তির সয়লাবে ভাসছে। জীবনে সুখ-শান্তির নামগন্ধও তাদের নেই। নিষ্ঠা ও দায়িত্বজ্ঞান, অগ্রাধিকার ও কুরবানি, ভালোবাসা ও সহমর্মিতা পশ্চিমা সমাজে অনুপস্থিত। পুরো সমাজই লাভের থিউরির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। কেউ কারো নয়। সবাই চায় স্বার্থ। স্ত্রী ততক্ষণ স্ত্রী থাকে, যতক্ষণ স্বামীর সাথে স্বার্থ জড়িত থাকে। স্বামী ততক্ষণ স্বামী থাকে, যতক্ষণ স্ত্রীর সাথে স্বার্থ জড়িত থাকে। অবস্থা এতই নাজুক যে, স্ত্রী স্বামীর ওপর ভরসা করতে পারে না। মা তার সন্তানের ওপর আস্থা রাখতে পারে না। বোন ভাইয়ের ওপর আস্থা রাখতে পারে না।

অথচ পশ্চিমা জীবনদর্শনের দাবিই হলো, একমাত্র পার্থিব জীবনকেই সুন্দর করা। পশ্চিমা বুদ্ধিজীবীরা ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করানোর জন্য প্রথম যে স্লোগানটি জাতির সামনে

তুলেছিল; তা হলো- তাদের কাছে যে জীবনদর্শন আছে, যে জীবনব্যবস্থা তারা নিয়ে এসেছে, তার ওপর চলে এমন এক উন্নতির মহাসড়কে ওঠতে পারবে, দুরাবস্থা কখনো তাদেরকে স্পর্শ করবে না। এ জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করার পর মানুষের জীবনমান এতই উন্নত হবে যে, চতুর্দিকে খাবারের পর্যাপ্ততা, তৃপ্তি ও মুক্তহৃদয়ই থাকবে। এমন এক সমাজ হবে, যেখানে শান্তি-নিরাপত্তা, মান-সম্মান থাকবে ভূরি ভূরি। মোট কথা, পৃথিবীটা পরিণত হবে সুখময় উদ্যানে!

কিন্তু সৃষ্টিকর্তার আনুগত্য না করে সৃষ্টি কীভাবে সুখ-শান্তি লাভ করবে? তাঁর দ্বীনকে জীবনব্যবস্থা হিসেবে মেনে নেওয়া ব্যতীত সুখ-সমৃদ্ধি কীভাবে সম্ভব? যে শরীয়ত মুহাম্মাদ ﷺ নিয়ে এসেছেন, তা বাস্তবায়ন না করে রহমতের আশা করা সুদূর পরাহত।

ভারতীয় বুদ্ধিজীবী ও ব্রাহ্মণ চিন্তাবিদেরা কি এ কথা অস্বীকার করতে পারবে যে, ভারতবর্ষে ইসলামের আলো আসার আগে ভারতীয় সমাজব্যবস্থা কেমন শোচনীয় অবস্থায় ছিল? হিন্দুসমাজ শ্রেণীবৈষম্য, সতীদাহ প্রথা ও মেয়েদেরকে অপয়া ধারণার ওপর দাঁড়িয়ে ছিল। শেষমেষ তো এমন হয়েছিল, স্বামী মৃত্যুবরণ করলে সাথে স্ত্রীকেও চিতার আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হতো।

সাধারণ মানুষকে জমিদার, মহারাজ, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা নিজেদের গোলাম বানিয়ে নিয়ে ছিল। প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম মানুষ তাদের দাসত্বে লিপ্ত ছিল। তারা সেই অধিকারও ভোগ করতে পারে নি, যা আজ কুকুর-বিড়ালরাও ভোগ করছে।

রহমাতুল্লিল আলামীনের এ দ্বীনই তো হিন্দুসমাজকে মানবতা শিখিয়েছে। মানবমর্যাদা ও পবিত্র সত্তার অপমানের কথা তাদের বুঝিয়েছে। ভারতীয় ব্রাহ্মণদের বুঝিয়েছে যে, মানুষের রক্ত জীবজন্তুর রক্তের চেয়ে অনেক মূল্যবান। তাদের সামনে এ রহস্য বাতলে দিয়েছে যে, পুরুষের মতো নারী সত্তাকেও আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। তার স্বামীর মৃত্যুতে সে এমন কোনো অপরাধ করেনি, যার কারণে তাকে জীবন্ত চিতার আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।

ভারতবর্ষ থেকে ধর্মীয় শাসনের সমাপ্তির পর অর্থাৎ ইংরেজরা দিল্লি দখল করার পর থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত এ সমাজটি অবর্ণনীয় অবস্থার শিকার। ব্যভিচার, ঘুষ, সুদ, জুলুম, শ্রেণীবৈষম্য (যদিও তার বিভিন্ন পরিবর্তন হয়েছে) এর মতো অসংখ্য চারিত্রিক অধঃপতনের উইপোকা এ সমাজকে শেষ করে দিয়েছে।

আশ্চর্য লাগে, এ আধুনিক যুগেও হিন্দুরা নিজেদেরকে পৃথিবীর অন্যতম পরাশক্তি হিসেবে পেশ করছে! এ পৃথিবীতে এখনো এমন মানুষও রয়ে গেছে, যারা নিজেদের খোদিত পাথরকে তাদের প্রভু হিসেবে মেনে নিয়েছে! নিজেরাই তাদের পুরোনো প্রভুদের ক্ষমতা কখনো বাড়ায়, কখনো কমায়! কখনো এক প্রভুর ক্ষমতা আরেকজনকে, কখনো কয়েক প্রভুর ক্ষমতা একজনের মাঝে সন্নিবেশ করে দেয়! বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও শিল্প-সাহিত্যে উৎকর্ষ-সাধনের দাবিদার ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা কি কখনো এ কথা চিন্তা করার সাহস করে না যে, শেষমেষ এ আধুনিক যুগেও অজ্ঞতার সেই পুরোনো আঁধারগুলো বিদ্যমান? টিভির পর্দায় বড় বড় স্লোগানধারীরা কি কখনো নিজেদেরকে নিয়ে একটু ভাবার সময় পায় না? নাকি এখনো

তাদের গলায় সেই ব্রাহ্মণ্যবাদী দড়ি ঝুলে আছে?- যা ইসলাম আসার আগে ছিল। হিন্দুধর্ম নিয়ে কথা বলা আজও কি সেই অন্ধকার যুগের ন্যায় অমার্জনীয় অপরাধ?

এসব মন্দ কাজের একটাই কারণ। তারা তাদের আসল সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে পারেনি। তাঁর প্রেরিত জীবনব্যবস্থাকে ত্যাগ করেছে।

সুতরাং পূর্ব-পশ্চিম আল্লাহদ্রোহিতার পরিণাম আজ ভালোভাবেই দেখতে পাচ্ছে। মানবজাতির ইতিহাসে কি কখনো মানুষ এত লাঞ্ছিত হয়েছে, যতটা এ আধুনিক যুগে হয়েছে? তোমরা মানুষের শান্তি ও নিরাপত্তা কেড়ে নিয়েছ। তোমরা তাদেরকে আসল স্রষ্টা থেকে দূরে সরিয়ে নিজেদের হাতে খোদিত পাথরের দাস বানিয়ে নিয়েছ। কোথাও গণতন্ত্রের নামে, কোথাও রাজতন্ত্রের আড়ালে, কোথাও সমাজতন্ত্রের ব্যানারে তো কোথাও পুঁজিতন্ত্রের শিরোনামে।

তোমরা মানবসমাজকে সেই জঙ্গলের চেয়ে নিকৃষ্ট বানিয়ে দিয়েছ, যেখানে জীবজন্তুরাও লজ্জাশরম ও চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখে। তোমরা পরিবারগুলোকে ধ্বংস করার এমন বীজ বপন করেছ যে, ঘরবাড়ি ও বংশধারা আজ বিলুপ্তির পথে। সন্তানরা ভুলে গেছে তাদের পিতামাতাকে। পিতামাতা ভুলে গেছে তাদের সন্তানকে। পশ্চিমাবাজারে তো মায়েদের মমতার লাশ দাফন করে দেওয়া হয়েছে। ভাইবোনের পবিত্র সম্পর্ক বিনষ্টকারী তোমরাই। তোমরাই তো নির্লজ্জতা, বেহায়াপনা ও সতীত্ববিক্রিকে এমন এক শিল্পে রূপ দিয়েছ যে, সেই সতীত্ববিক্রির টাকায় তোমাদের রাজত্ব ফুলে ওঠছে। তোমাদের বেহায়াপনা দেখে অভিজাত পরিবারগুলো লজ্জা ও পবিত্রতার জন্য মাতম করছে। বিকৃঙ্খলায় ভরা শহরগুলোয়

লজ্জাশরমের অবস্থা এতই শোচনীয় যে, কোথাও সসম্মানে থাকাও মুশকিল। তোমরা সাধারণ নাগরিকদের কী অধিকার দেবে? তোমরা তো তাদের একটি বড় অংশকে স্বীয় বংশধারা থেকেও বঞ্চিত করেছ। তারপরও বড় গলায় বলছ যে, তোমাদের লাইফ স্টাইলই মানবতাকে সম্মানিত করতে পারে!!

তোমাদের সঞ্চয়ের লোভ বাজারের বিশ্বস্ততা ছিনিয়ে নিয়ে বেঈমানি ও ধোঁকায় সেই স্থান দখল করে নিয়েছে। কোনো অঙ্গীকার রক্ষা করা হয় না। রাখা হয় না কারো কথা। রিযিকের নামে তোমরা পুরো মানবসভ্যতাকে সুদে জড়িত করেছ এবং একটি একটি রুটির টুকরোর মালিক বানিয়ে দিয়েছ। তোমাদের এ ঘৃণ্য সুদব্যবস্থার ফলে মূল্যবৃদ্ধি, বাজারমন্দা, প্রতারণা ও জালিয়াতি ছাড়া মানুষ কিছুই পেল না।

সন্দেহ নেই যে, পশ্চিমা সভ্যতা প্রযুক্তির মাধ্যমে আকাশছোঁয়া অট্টালিকা নির্মাণ করেছে। কিন্তু সেখানকার বাসিন্দারা চারিত্রিক ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিপতিত, সেখানে মানবতা চরমভাবে লজ্জিত। স্বীকার করি, আধুনিক প্রযুক্তি পশ্চিমা জাতির জীবনে এত গতি এনেছে যে, একজন তরুণ তার কামরায় বসেই পুরো পৃথিবীর খবর রাখতে পারছে। কিন্তু তারা মানবতা থেকে এতই দূরে অবস্থান করছে যে, পাশের কামরার বুড়ো মায়ের খবরও পর্যন্ত নেয় না, যিনি এক গ্লাস পানির অভাবে শুকিয়ে হাড্ডিসার হয়ে যাচ্ছে। প্রযু্ক্তির উৎকর্ষ ও গতিময় উপার্জনব্যবস্থা তরুণদের আয় বহুগুণ বাড়িয়েছে; কিন্তু সুদব্যবস্থায় জড়িয়ে তরুণরা ব্যাংক ও মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি থেকে ঋণ নিতে নিতে বার্ধক্যে উপনীত হচ্ছে। কৃষির আধুনিকায়নের ফলে কৃষকরা দ্রুত ফসল উৎপাদন তো করছে; কিন্তু এ জমিনে আল্লাহর

শরীয়াহ বাস্তবায়িত না হওয়ায় জমিন তার খাদ্যগুণ আটকে রেখেছে। এখন জমি তো অনেক আছে; কিন্তু অনেক কষ্টের বিনীময়ে অল্পই তাতে উৎপাদিত হয়। যার উপকারিতাও অনেক কম। খাদ্যগুণ নেই বললেই চলে। দেখতে প্রত্যেকটি খুব বড় ও মোটা মনে হয়; কিন্তু তাতে খাদ্যগুণের রেশও থাকে না!

মোট কথা, তোমাদের সভ্যতা-দর্শন, সক্ষমতা ও জীবনব্যবস্থা, শিক্ষা ও অর্থনীতি, গণতন্ত্র ও সংসদীয় সিস্টেম- সবই ব্যর্থ হয়েছে। সময়ই বলে দিচ্ছে, পশ্চিমা চিন্তাবিদরা যেসব বাদ-মতবাদ আবিষ্কার করেছে, তা স্পর্শকাতর স্থানে অবস্থান করছিল। আসমানকে সাক্ষী রেখে বলছি, তোমাদের সভ্যতা নিজের খঞ্জর দিয়ে আত্মঘাতী করছে। যে সভ্যতাকে তোমরা মেকআপ করে সাজিয়েগুছিয়ে দুনিয়াবাসীর সাথে প্রতারণা করেছিলে, আজ সেটির লাশ থেকে পোকামাকড় বের হচ্ছে, যার দুর্গন্ধ এ সাত সমুদ্রের এপারের জীবনও বিপর্যস্ত করে তুলছে।

তোমরা মানুষকে আদর্শ চরিত্র ও উত্তম শিষ্টাচার কী শিখাবে? বাস্তবতা হলো, তোমরা শয়তানের আদর্শ ও তার আশা-আকাক্সক্ষাই বাস্তবায়ন করছ। এখনো তোমরা তার মিশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পৃথিবীকে যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছ। হয়তো তোমরা ভাবছ, আরও রক্ত প্রবাহিত করে বিশ্বকে জয় করার প্রতিযোগিতায় জিতবে এবং এভাবে আগামীর বিশ্ব তোমাদের হাতের মুঠোয় থাকবে।

কিন্তু এটি পাগলের দুঃস্বপ্ন মাত্র!

این خیال است و محال است و جنوں

"সবই খেয়ালিপনা, অসম্ভব বিষয়ের মাতলামি।"

তোমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, দিনরাত পৃথিবীজুড়ে তোমাদের ভ্রমণ- সবই শয়তানের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য।

মহান আল্লাহ বলেন-

﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

"আর বস্তুত তাদের ওপর ইবলীস তার অনুমান সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করল। ফলে তাদের মধ্যে মুমিনদের একটি দল ব্যতীত সকলেই তার পথ অনুসরণ করল।"

আল্লাহর কুরআন আজকের এ একবিংশ শতাব্দীতেও তোমাদেরকে ধমক দিয়ে বলছে, হে নব্য জাহেলী সভ্যতার মানুষ! তুমি ক্ষতিতে নিপতিত। তোমার প্রতিটি মুহূর্ত ক্ষতি ও ধ্বংসের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। তুমি সমুদ্রগভীরে হাবুডুবু খাচ্ছ; কিংবা শূন্যে ওড়ছ তুলোর মতো। তোমার বৈষয়িক উন্নতি, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, আলোকোজ্জ্বল শহর- সবই থাকা সত্ত্বেও তোমার এক এক মুহূর্ত, একেক সেকে-, একেক নিঃশ্বাস তোমার ক্ষতিই বৃদ্ধি করছে। যদিও তোমার অদূরদৃষ্টির কারণে তুমি মনে করছ, নব্য জাহিলিয়্যাত উন্নতিই করছে। তুমি সৃষ্টির রহস্যের খোঁজে এগিয়ে যাচ্ছ। তোমার জীবনোপকরণ উন্নত হচ্ছে। তোমার সোনাদানা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সবই দৃষ্টিভ্রম ও আত্মপ্রবঞ্চনা।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও গণতন্ত্র: এক ভয়ানক কুফর

গণতন্ত্র (সেটি প্রাচ্যের হোক বা পাশ্চত্যের কিংবা বলা হোক ইসলামী) এর আসল হৃদপিণ্ড হলো ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি। এর মধ্যে প্রবেশ করে কারো এ ধারণা করা যে, তারা ইসলামী রাজনীতি করছে, অথবা গণতন্ত্রকে ইসলামী ও ধর্মনিরপেক্ষ- এ দু'ভাগে ভাগ করার অর্থ হলো, মদকে ইসলামী ও ধর্মনিরপেক্ষ- এ দু'ভাগে ভাগ করা।

নিঃসন্দেহে নব্য জাহেলী যুগ প্রতারণার বিচারে অদ্বিতীয়। গণতন্ত্রের নামে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের যে কুফরীতে পৃথিবীকে আক্রান্ত করা হয়েছে, এর গভীরতা ও প্রশস্ততা পাঠ করার পর এ কথা বলা অযৌক্তিক হবে না যে, শয়তান তার জীবনের সব অভিজ্ঞতা নিংড়ে এ ব্যবস্থায় ঢুকিয়ে দিয়েছে। সে তার চিরশত্রু মানুষকে এবার এমন এক কুফরীতে জড়িয়ে দিয়েছে, যা মানুষ অনুভবই করতে পারে না।

এ কুফর অতীতের কুফরের চেয়ে ভিন্ন। অতীতে যত কুফর ছিল, তাতে কুফরের ধরন ছিল যে, যখন কেউ নিজের ধর্ম থেকে বের হয়ে অন্য কোনো ধর্মে প্রবেশ করত, তখন তাকে কাফের বলা হতো। কিন্তু এ নব্য কুফর গণতন্ত্রে আল্লাহকেও সরাসরি অস্বীকার করা হয় না, আবার আল্লাহ প্রেরিত নবীকেও সরাসরি অস্বীকার করা হয় না। তেমনি কুরআন, কিয়ামত ও আখিরাতও অস্বীকার করা হয় না। এটি এমন এক কুফর, যা নামাজ-রোজাকে বাধ্যতামূলকও করে না, আবার এগুলো আবশ্যক- এ বিশ্বাসও রাখতে দেয় না; বরং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নামাজ মুবাহের পর্যায়ভুক্ত। মন চাইলে পড়বে, না চাইলে পড়বে না। এ নব্য ধর্ম তার ভিকটিমকে আগের ধর্ম ত্যাগ করতে বলে না। কোনো ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানের সাথে

বিদ্রোহও করানো হয় না; বরং তা আদায় করেও সামাজিক জীবন এক নতুন ধর্ম ও জীবনব্যবস্থা (ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও গণতন্ত্র) অনুযায়ী পরিচালিত করতে বাধ্য করে।

মুফতী তাকী উসমানী সাহেব দা.বা. তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিমে এটির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন-

مكانة السياسة في الدين

قد اشتهر عن النصارى أنهم يفرقون بين الدين والسياسة بقولهم: "دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله"، فكان الدين لا علاقة لها بالسياسة، والسياسة لا ربط لها بالدين، وإن هذه النظرية الباطلة قد تدرجت إلى أبشع صورا في العصور الأخيرة بإسم "العلمانية" أو "سيكولرازم" التي أخرجت الدين من سائر شؤون الحياة حتى قضت عليها بتاتا.

وإن هذه النظرية في الحقيقة نوع من أنواع الإشراك بالله، من حيث أنها لا تعترف للدين بسلطة في الحياة المادية، فكأن الإله ليس إله إلا في العبادات والرسوم، وأما الأمور الدنيوية فلها إله أخر، والعياذ بالله.

ধর্মে রাজনীতির স্থান

‘খৃষ্টানদের ধর্মের ব্যাপারে এ কথা প্রসিদ্ধ যে, তারা ধর্ম ও রাজনীতির মাঝে পার্থক্য করে। তারা বলে, যা বাদশার অধিকার, তা বাদশাকে দাও। আর যা আল্লাহর হক্ব, তা আল্লাহকে দাও। যেন ধর্মের সাথে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই। এ ভ্রান্ত মতবাদ শেষযুগে

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বা সেক্যুলারিজম এর নামে তার কুৎসিতরূপে আবর্তিত হয়েছে। যা ধর্মকে জীবনের প্রতিটি শাখা থেকে বের করে দিয়েছে। এমনকি ধর্মকে মিটিয়ে দিয়েছে।

এ মতবাদ আসলে কুফরের একটি প্রকরণ। কারণ, এটি বৈষয়িক জীবনে ধর্মের ক্ষমতাকে স্বীকার করে না। এ মতবাদ ধর্মের অবদান এতটুকু স্বীকার করে, যতটুকু মানুষ একাকিত্বে বা উপাসনালয়ে আদায় করে। যেন ধর্ম কিছু আচার-অনুষ্ঠানেরই নাম। আর পার্থিব বিষয়াবলির জন্য তাদের রয়েছে অন্যান্য প্রভু। নাউযুবিল্লাহ!'

উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, যেহেতু এ নব্য কুফরে পূর্বের ধর্ম থেকে বের হয়ে যাওয়া আবশ্যক নয়, তাই অনেকে এ কুফরী ধর্মের কুফরীই বুঝে না। তারা স্বীয় ধর্ম পালনের পাশাপাশি আরেকটি নতুন ধর্মকেও জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করে নেয়। খৃষ্টানরা রবিবারে গির্জায় যেতে পেরেই সন্তুষ্ট। কারণ, নতুন এ ধর্ম ইবাদতের ব্যাপারে তাদের প্রতি কোনো বাধ্যবাধকতা আরোপ করেনি। পুরো সমাজব্যবস্থা যে ইয়াহুদীদের তৈরি সেক্যুলারিজম এর অধীনে চলে যাচ্ছে- সেটার কোনো পরোয়া তারা করত না।

তেমনিভাবে মুসলমানদেরকে এ ধর্মে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রথমে খিলাফাহ ব্যবস্থা ভেঙে ফেলা হয়; যাতে কুরআনে কারীমের জীবনব্যবস্থা তাদের জীবন থেকে বিদায় নেয় এবং তারা শুধু ইবাদতকেই ধর্ম মনে করে। এর জন্য প্রাচ্যবিদ, তথাকথিত প্রগতিশীল ও আধুনিকমনা বুদ্ধিজীবীদের মাধ্যমে ধারাবাহিক প্রয়াস চালানো হয়। শরয়ী পরিভাষাসমূহের অর্থ বিকৃত করা হয়। যেমন ফকিহগণ ধর্মীয় স্বাধীনতার এক ব্যাখ্যা দেন; কিন্তু ইংরেজ মুফতী ও কাদিয়ানীমার্কা মুফতীরা তার ব্যাখ্যা নতুন করে দেয়। তেমনিভাবে দারুল হারব ও দারুল

ইসলামের রূপ, হাকিমিয়্যাহ ও আল-ওয়ালা ওয়াল-বারার রূপ, আল্লাহর আইন ও গাইরুল্লাহ'র আইনে বিচারকার্য- সবগুলোকে এমন সব অর্থে দাঁড় করিয়েছে যে, ফকিহগণের কথাগুলো পুরনো কিতাবাদিতেই রয়ে গেছে।

মুসলমানদেরকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য পাশ্চত্যের গণতন্ত্র শরয়ী পরিভাষাসমূহকে খুবই শঠতার সাথে ব্যবহার করেছে। যেখানেই গণতন্ত্রের কুফরী স্পষ্ট হওয়ার আশংকা ছিল, সেখানেই নতুন পরিভাষা সৃষ্টি করা হয়েছে।

মুসলমানদেরকে কিছু আচার-অনুষ্ঠান ও কিছু ইবাদতের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, অথচ তাদের সামাজিক জীবন থেকে শুধু ধর্মকেই বিতাড়ন করা হয়নি; বরং সামাজিক জীবনের জন্য কুফরের স্রষ্টারা তাদের জন্য একটি নতুন ধর্ম আবিষ্কার করে। যে ধর্ম মতে জীবন পরিচালনা করা জাতিসংঘের সব সদস্য রাষ্ট্রকে আবশ্যিকভাবে পালন করতে হয়। কুফরী আইন ও জীবনব্যবস্থাকে জোরপূর্বক মুসলমানদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে; কিন্তু এটি তারা অনুভব করতে পারেনি। কারণ, নামাজ, রোজা, হাজ্ব ইত্যাদির অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। ইসলামী নাম রাখতেও নিষেধাজ্ঞা করা হয়নি। কারণ, তাদের মতে কুফর হলো ইসলাম থেকে পূর্ণাঙ্গভাবে বের হয়ে যাওয়ার নাম। কেউ নতুন ধর্ম গ্রহণ করে নাম পরিবর্তন করাকেই কুফরী মনে করা হতো; তবে নব্য কুফর এমন কোনো কিছুই দাবি করছে না।

কিন্তু গণতন্ত্র ও সেক্যুলার সিস্টেমে একটু চিন্তা করলেই এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এটি একটি ধর্ম; তাতে রয়েছে নিজস্ব হালাল-হারাম। রয়েছে ফরয-ওয়াজিব। রয়েছে শত্রুতা-বন্ধুত্বের আলাদা মাপকাঠি। এসব তো স্বতন্ত্র ধর্মের মধ্যেই থাকে। কিন্তু এ ব্যবস্থার

ধূর্ততা দেখুন, তার দাবি হলো, গণতন্ত্রে বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে কোনো ধর্মের আবশ্যকতা বা কোনো ধর্মের প্রতি নিষেধাজ্ঞা নেই। তাতে প্রত্যেক ধর্মই স্বাধীন; অথচ চিন্তা করলে বুঝা যায়, এটি এ সিস্টেমের প্রতারণা। পরিভাষাসমূহকে শঠতাপূর্ণ পন্থায় ব্যবহার করে মুসলমানদের সামনে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

কুফর যে ধরনেরই হোক, সেটি একটি ধর্ম। যদিও সেটিকে ধর্মহীনতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র, স্বাধীনতা বা ইসলামী গণতন্ত্রে নামকরণ করা হোক না কেন। এ ব্যাপারে আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভী রহ. অনেক মূল্যবান কথা বলেছেন।

‘কুফর শুধু একটি না বাচক বিষয় নয়; বরং তা হ্যাঁ বাচক ও প্রমাণিত বিষয়। শুধু আল্লাহর দ্বীন অস্বীকার করার নাম কুফর নয়; বরং সেটিও একটি ধর্মীয়, চারিত্রিক ব্যবস্থা ও বিশেষ একটি ধর্ম। যেখানে রয়েছে ফরয-ওয়াজিব। মাকরূহ-হারাম। তাই এ দুই ধর্ম এক স্থানে একত্রিত হতে পারে না। একজন মানুষ একই সময়ে দুই ধর্মের প্রতি আনুগত্য করতে পারে না।’

গণতন্ত্রে যেসব শরীয়াহবিরোধী বিষয় মিশে গেছে

আল্লাহর নাযিলকৃত শরীয়াহ ধ্বংস এবং মানব রচিত জাহেলী জীবনব্যবস্থা বাস্তবায়িত হওয়ায় মানবসমাজ কীভাবে দিন দিন ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে, স্রষ্টার সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টার আইন বাস্তবায়িত না হওয়ায় সমাজে বর্বরতা কীভাবে ছড়িয়ে পড়ছে?- তা সমাজকে দেখেই আন্দাজ করা যায়। সেসব বর্ণনা করলে বইয়ের কলেবর বেড়ে যাবে; তাই এখানে সেসব

শরীয়াহবিরোধী পয়েন্ট উল্লেখ করছি, যা থেকে প্রত্যেক মুসলমানকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে।

১. আল্লাহর আইনকানুনকে পার্লামেন্ট এর মুখাপেক্ষী বানানো:

প্রাচ্যের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শরীয়াহবিরোধী ও কুফরীর এ প্রকারটি খুবই আশ্চর্যজনক। এ কুফরী সেই প্রাচ্যের গণতন্ত্রে অনুপস্থিত, যাকে তারা পশ্চিমা, লিবারেল বা ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র নামে অবহিত করে। কারণ, তারা তো সরাসরি অস্বীকার করে এবং নতুন শরীয়াহ প্রবর্তনে নিজেদেরকে স্বাধীন মনে করে। তারা ধর্মকে রাষ্ট্রীয় সব কার্যকলাপ থেকে শুরু থেকেই ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিয়েছে। আর ভারতের মতো কুফরী রাষ্ট্রের জন্য কুফরের এ নতুন প্রকারটির সাথে পরিচিত হওয়ার প্রয়োজনই নেই।

কুফরের এই আশ্চর্যজনক প্রকরণটি সেই গণতন্ত্রের ফসল, যেটিকে ইসলামী প্রমাণের অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে। আল্লাহর অকাট্য আয়াত অর্থাৎ যেসব আইনকানুন আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে বর্ণনা করেছেন অথবা যা রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, সেগুলোকে ইসলামী গণতন্ত্রে ঐ সময় পর্যন্ত আইন হিসেবে মেনে নেওয়া হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সংসদে সদস্যদের বৈঠক করার পর ওগুলোকে অনুমোদন করার প্রতি মুখাপেক্ষী বানায়। নাউযুবিল্লাহ! এরপর সংসদ তা পাশ করলে আইনে পরিণত হবে। নয়তো বলে দেবে যে-

﴿ ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ ﴾

“এটি ছাড়া অন্য একটি কুরআন নিয়ে এসো, যেটিকে আমরা ধর্ম হিসেবে মানতে পারব বা এটিতে পরিবর্তন করে অনুমোদন করে দাও।” (নাউযুবিল্লাহ!)

অতএব উলামায়ে হক্কের কাছে আরয হলো, এসব বাতিলের প্রতারণা সর্বদা আলোচনা করবেন। আমাদের সবাইকে সেই রবের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে, যেখানে কারো ক্ষমতা, কারো শক্তি, কারো ধমক চলবে না। এ সরকারি প্রটোকল কোনো কাজে আসবে না।

এটিকে ¯পষ্টভাবে আলোচনা করা আবশ্যক। আল্লাহর আইনকে অনুমোদন করতে পার্লামেন্ট এর মুখাপেক্ষী হওয়া এমন কুফরী, যা ইসলাম থেকে বের করে দেয়। এটাই প্রত্যেক গণতান্ত্রিক সরকারের রাষ্ট্রীয় ধর্ম। এটিই গণতন্ত্রের প্রাণ ও মনন।

তারপরও দাবি হলো, সেই সরকারের সর্বোচ্চ আইনপ্রণেতা তো আল্লাহই। আল্লাহ কুরআনে কতই না সুন্দর বলেছেন! যেন এখনই তাজা তাজা অবতীর্ণ হচ্ছে-

﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾

“আল্লাহ যেসব শস্যক্ষেত্র ও জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন, সেগুলো থেকে তারা এক অংশ আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করে, অতঃপর নিজ ধারণা অনুসারে বলে, এটা আল্লাহর এবং এটা আমাদের অংশীদারদের। অতঃপর যে অংশ তাদের অংশীদারদের, তা তো আল্লাহর দিকে পৌঁছে না এবং যা আল্লাহর তা তাদের উপাস্যদের দিকে পৌঁছে যায়। তাদের বিচার কতই না মন্দ!”

নব্য জাহিলিয়্যাতের গোলামরাও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা স¤পর্কে বলে, আইন প্রণয়নের ক্ষমতা তো আল্লাহর কাছেই। কিন্তু বাস্তবে তারা আল্লাহর সেই হক্বটি পার্লামেন্ট কে দিয়ে দেয় যে, পার্লামেন্ট আল্লাহর যে হুকুমকেই চায়, যেভাবেই চায়, পরিবর্তন করতে পারবে। চাই তা রজম হোক! যেটির অস্বীকারকারী কাফির হওয়াতে কারো দ্বিমত নেই।

আর আল্লাহর হক্বগুলোর প্রতি কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই। অর্থাৎ যে বস্তুকে আল্লাহ হারাম করেছেন, তা হালাল করার ক্ষমতা পার্লামেন্ট কে দিয়ে দেয়। যেমন সুদ এবং মুসলমানদেরকে হত্যা করার জন্য আমেরিকাকে সঙ্গ দেওয়া। এ ব্যাপারে এটুকুও চিন্তা করে না যে, সু্দি লেনদেনকারীদের বিরুদ্ধে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন। আর মুসলামনদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সঙ্গ দেওয়া ইসলাম থেকে বের হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

পক্ষান্তরে তারা নিজেদের মূর্তির হক্বগুলো পুরোপুরি সুরক্ষিত রাখে। যাদেরকে আল্লাহর হুকুম ও হাকিমিয়্যাহর ওপরে স্থান দেয়। তারা বলে, যতক্ষণ পর্যন্ত পার্লামেন্ট কোনো আইন অনুমোদন না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা আইন হতে পারে না। এভাবে তারা পার্লামেন্ট নামক মূর্তিকে পুরো অধিকার দিয়ে রেখেছে। তাতে আইন প্রণয়নের সময় আল্লাহকে কেয়ারই করা হয় না। কিন্তু আইনে লেখা আছে যে, হাকিমিয়্যাহর ক্ষমতা আল্লাহর জন্যই।

﴿ فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا ﴾

“সুতরাং তারা নিজ ধারণা মতে বলে, এ অংশ আল্লাহর। আর এটা আমাদের মা’বূদদের জন্য, যাদেরকে আমরা আল্লাহর শরীক মনে করি।”

কতই না মন্দ তাদের ফায়সালা, যা তারা আরশ-কুরসীর মালিকের সাথে করছে।

﴿ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ـ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ـ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾

“তোমাদের এ বিপদ এ কারণে যে, যখন এক আল্লাহকে ডাকা হতো, তখন তোমরা কুফরী করতে। যখন তাঁর সাথে শরীককে ডাকা হতো, তখন তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করতে। এখন আদেশ তাই, যা আল্লাহ করবেন, যিনি সর্বোচ্চ, মহান। তিনিই তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলি দেখান এবং তোমাদের জন্য আকাশ থেকে নাযিল করেন রিযিক। চিন্তা-ভাবনা তারাই করে, যারা আল্লাহর দিকে রুজু থাকে। অতএব, তোমরা আল্লাহকে খাঁটি বিশ্বাস সহকারে ডাকো, যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে।”

২. আল্লাহর সাথে কুফরী:

তাশরী' তথা আইন প্রণয়নের অধিকার পার্লামেন্ট কে দিয়ে দেওয়া। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে আল্লাহর সাথে কৃত এটি এমন এক কুফর, যা ছাড়া কোনো সরকারকেই গণতান্ত্রিক বলা হবে না। সেই গণতন্ত্রের সুরক্ষার জন্য রয়েছে প্রত্যেক দেশে জাতীয় নিরাপত্তাবাহিনী। যারা সেটিকে সুরক্ষা দিতে সদা তৎপর। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো তাদের সুরক্ষা দিতে বদ্ধপরিকর।

পাকিস্তানে ক্ষমতাসীনরা ধর্মীয় নেতাদেরকে প্রতারণা করে বলে যে, পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র। কারণ, তার আইন ইসলামী। প্রমাণ হলো, তার সংবিধানে লেখা আছে- কুরআন-সুন্নাহই হবে পাকিস্তানের আইন।

সেনাবাহিনী ও গোপন এজেন্সিগুলো বা ক্ষমতাসীনশ্রেণী, যারা ক্ষমতার মজা লুটছে; তারা এসব কথা বলে সাধারণ মুসলমানকে যে ধোঁকা দিচ্ছে, তা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু উলামায়ে কেরামের কী হলো, তারা জেনেবুঝেই অর্ধশতাব্দীর বেশি সময় এ ফাঁদ থেকে বের হতে পারছে না যে, পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র বা এর আইন শুধু এ জন্য ইসলামী যে, এর সংবিধানে এক বাক্য লেখা আছে।

আল্লাহ তাআলা সবার হৃদয়ের রহস্য ভালোভাবেই জানেন। কারা আল্লাহর বাণীর পরিবর্তন করছে? কারা ব্যাখ্যার মাধ্যমে ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতাকে সুরক্ষা দেয়? কারা এর বিনীময়ে জানের নিরাপত্তা পায়? কারা এর বিনীময়ে এ তুচ্ছ দুনিয়ার দুর্গন্ধে কতবার মুখ ঘষছে?- সর্বজ্ঞানী আল্লাহ সবই ভালোভাবে জানেন।

বাস্তবতা সবার সামনে স্পষ্ট, পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইন প্রণয়নের সর্বোচ্চ ক্ষমতা আল্লাহ জন্য বরাদ্দ নাকি ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গের হাতে? আজ সত্তর বছরের অধিক সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও এ দেশে আল্লাহর হুকুমত চলেছে নাকি সংসদের হুকুমত চলেছে?

বাস্তবতা হলো, অন্যান্য রাষ্ট্রের মতো পাকিস্তানের আইন প্রণয়নের সর্বোচ্চ ক্ষমতাও সেই ক্ষমতাশালীদের হাতেই। এর সবচেয়ে বড় দলিল হলো, পাকিস্তানের সংবিধানে যদিও এ

কথা লিখা আছে যে, কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কোনো আইন পাশ করা হবে না। বা কুরআন-সুন্নাহই পাকিস্তানের সর্বোচ্চ আইন; কিন্তু বাস্তবতা হলো, প্রতিদিন কুরআন-সুন্নাহর বিরুদ্ধে পার্লামেন্টে আইন পাশ করা হচ্ছে। সংবিধানে যদিও উক্ত বাক্যটি লিখা আছে; তবুও আসল ক্ষমতা পার্লামেন্টের কাছেই। এ পার্লামেন্ট যতক্ষণ পর্যন্ত কুরআনের আইনকে অনুমোদন না করবে, তা আইনে পরিণত হবে না। পাকিস্তানের জন্মের পর থেকে আজকের দিন পর্যন্ত এর নির্মম সাক্ষী। সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য এ সময়টি কি যথেষ্ট নয় যে, এখানে আইন প্রণয়নের সর্বোচ্চ ক্ষমতা কার কাছে আছে? এর বিপরীতে আপনি এমন কোনো ঘটনা বলুন, এ ইসলামী গণতন্ত্রে আল্লাহর আইনকে পার্লামেন্টের অনুমোদন ছাড়াই আইনে পরিণত করা হয়েছে। অথবা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এ ঘোষণা দেওয়া হয়েছে যে, যেহেতু বিবাহিত ব্যভিচারী-ব্যভিচারিনীকে প্রস্তরনিক্ষেপে হত্যা করা আল্লাহর আইন। তাই রাষ্ট্রের আইনও এটিই। এটিকে পার্লামেন্টের মুখাপেক্ষী বানানোর কোনো প্রয়োজন নেই। তেমনি সুদ আল্লাহর আইনে হারাম। তাই পার্লামেন্টের অনুমোদন ছাড়াই আজ থেকে সুদ হারাম ও অবৈধ।

কিন্তু এমনটি হবে না! কারণ, তাতে গণতন্ত্রের হৃদয় ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী স্থানীয় নিরাপত্তাবাহিনীগুলো এবং আন্তর্জাতিক পরাশক্তি আমেরিকা এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নিয়ে এমন প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্টকে পদচ্যুত করে দেবে।

এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, গণতন্ত্রের প্রাণ (আইন প্রণয়নে পার্লামেন্টের অনুমোদনই আসল হওয়া)-ই রাষ্ট্রের ক্রীড়নক। সংবিধানে কালো কালিতে লিপিবদ্ধ এ বাক্যটি নয়- কুরআন-সুন্নাহই পাকিস্তানের সর্বোচ্চ আইন।

আল্লাহর ওয়াস্তে এ প্রতারণার জাল থেকে বেরিয়ে আসুন। পাকিস্তানের আইন যেমন ইসলামী নয়, তেমনি এখানে কুরআন-সুন্নাহর আইন প্রণয়নের ক্ষমতাও নেই।

ফলাফল: পাকিস্তান কি কালেমা পাঠ করেছে?

এ পর্যায়ে ক্ষমতাসীনদের পক্ষ থেকে এ বলে প্রতারণা করার চেষ্টা করা হয় যে, রাষ্ট্র তো কালেমা পাঠ করেছে। অর্থাৎ রাষ্ট্র এ কথার বিশ্বাস রাখে যে, আইন প্রণয়ন ও হাকিমিয়্যাহর ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর জন্য আছে। সমস্যা তো তা বাস্তবায়নে। সুতরাং বিশ্বাস ঠিক থাকলে কাজের দুর্বলতার কারণে কাউকে কাফের বলা যায় না।

এটি একটি নিরেট ভুল ধারণা। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে উক্ত বিশ্বাস রাখা সত্ত্বেও যদি কেউ কাজের বেলায় সেই ক্ষমতা (আদেশ-নিষেধের ক্ষমতা) আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে সোপর্দ করে, এটিও কুফরী। যেমন ওপরে খৃষ্টানদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, তারা তাদের পাদ্রীদেরকে উপাস্য বানিয়ে নেয়নি; বরং তাদের কাজ ছিল, আইন প্রণয়নের ক্ষমতা পাদ্রীদের জন্য মেনে নেওয়া। এটিকেই কুরআন উপাস্য বানানো বলেছে, যেটির ব্যাখ্যা রাসূল ﷺ নিজেই দিয়েছেন।

ইমাম রাযী রহ. এর তাফসীরে যা বলেছেন, তা দ্বিতীয়বার পড়ুন-

المسألة الثانية: الأكثرون من المفسرين قالوا: ليس المراد من الأرباب أنهم اعتقدوا فيهم أنهم آلهة العالم، بل المراد أنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم

‘অধিকাংশ মুফাসসিরের মতামত হলো, রব বানানো থেকে এ কথা উদ্দেশ্য নয় যে, তারা নিজেদের পাদ্রীদের ব্যাপারেও এ বিশ্বাস রাখতে শুরু করেছে যে, তারাই জগতের উপাস্য; বরং এর উদ্দেশ্য হলো, তারা হুকুম ও আইনকানুনে সেসব পাদ্রীর অনুসরণ করত।’

অথচ এ বিশ্বাস রাখার জন্য গণতন্ত্র বাধ্য করছে। এটিকে তার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করেছে। এর দলিল হলো, কোনো শহরবাসী বা কোনো সংসদ সদস্য এ কথা বলতে পারে না যে, রাষ্ট্রপরিচালনার এ পদ্ধতি (কোনো বিল পাশ করানোর জন্য পার্লামেন্টে পেশ করা) আমি মানি না। এটি শরীয়াহবিরোধী, কুফরী। তখন দেখবেন, সেই কুফরের রক্ষক শক্তিগুলো এ লোককে কেমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়।

কোনো জাতিরই নেতৃস্থানীয় লোকজন আল্লাহর কিতাব ছেড়ে নিজেই শরীয়তপ্রণেতা কেন হয়ে যায়? কেন তারা আইন প্রণয়নে হাত দিয়ে দেয় এবং আল্লাহর সেই ক্ষমতাকে নিজের হাতে তুলে নেয়?

কারণ, সেই ক্ষমতার মাধ্যমে যে সে নিজের দাপট-কর্তৃত্বের ভিত্তি মজবুত করতে পারে! নিজের এবং তার সমমনাদের প্রবৃত্তির সুরক্ষা দিতে পারে! এর মাধ্যমে ইচ্ছামতো আইন তৈরি করতে পারে এবং সাধারণ মানুষকে নিজেদের দাস বানিয়ে রাখতে পারে! তারপর সেই আইন প্রণয়নকে সম্মানিত করার জন্য সেটিকে কোনো ধর্ম বা কোনো বাদ-মতবাদের মুখোশ পরিয়ে দেয়; যাতে মানুষ ধর্মীয় শ্রদ্ধাবোধ নিয়ে সেটির ইবাদত করে এবং সেটির

বিরোধিতাকে পাপ মনে করে। ফলে সাধারণ মানুষ পুরো জীবন নেতৃস্থানীয়দের সেবাদাস হয়েই থাকে।

এ ক্ষমতা অর্জিত হওয়ার পর ক্ষমতাশালীরা শুধু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আইন প্রণয়নই করেনি; বরং সমাজকে নিজেদের ক্ষমতার ক্রীড়নক বানাতেও নিজেদের পক্ষ থেকে আইন বানিয়ে নেয়। তারা আল্লাহর অনুমতি ছাড়াই পরিপূর্ণ একটি ধর্ম বানিয়ে নেয়।

মক্কার জাহেলী যুগের পার্লামেন্ট (দারুন নাদওয়া) এই কাজই করত। নিজেদের কর্তৃত্ব, ক্ষমতা, দাপট, রাজত্বকে দৃঢ় করার জন্য যা ইচ্ছা হালাল বা বৈধ করে দিত, যা ইচ্ছা হারাম বা অবৈধ করে দিত। তারপর সেই আইন প্রণয়নকে ধর্মের মুখোশ পরানোর জন্য নিজেদের উপাস্যদের দিকে সম্বন্ধ করে দিত যে, এসব তো তোমাদের উপাস্যদের পক্ষ থেকে; যাতে মূর্খ মানুষ তাতে প্রশ্ন করার অবকাশ না পায়।

এখানে সেই ধর্মীয় রাজনৈতিক বাস্তবতা বুঝা প্রয়োজন যে, প্রত্যেক যুগে ক্ষমতাবানরা আইন প্রণয়নের পর সেটিকে নিজেদের প্রভুদের প্রতি সম্বন্ধ করেছে। (সেই প্রভু কোনো মূর্তি হোক বা কোনো ভবন হোক বা কোনো সংস্থা)। এ ক্ষমতাবানশ্রেণী সেই আইন প্রণয়নকে নিজেদের দিকে সম্বন্ধ করে না। নব্য জাহেলী ব্যবস্থায় হাকিমিয়্যাহর সব ক্ষমতাকে জনগণের দিকে সম্বন্ধ করা হয়। আর এটিই হলো, এ জাহেলী ব্যবস্থার প্রধান প্রতারণা। বাস্তবতা হলো, সব ক্ষমতা নেতাদের হাতেই থাকে। ঠিক যেমনটি করে পাথর কিংবা ভবন পূজারিরা, তারা সব ক্ষমতা পাথর কিংবা ভবনকে দেওয়ার আড়ালে নিজেদের খায়েশই বাস্তবায়ন করছে। অথবা মৃত ব্যক্তির কথা বলে মাজারের মুতাওয়াল্লীরা নিজেদের প্রবৃত্তিকেই পূর্ণ করছে।

ইমাম রাযী রহ. এ সত্যকে উৎঘাটন করে বলেন-

وَقَالَ الْكَلْبِيُّ: كَانَ لِآلِهَتِهِمْ سَدَنَةٌ وَخُدَّامٌ وَهُمُ الَّذِينَ كَانُوا يُزَيِّنُونَ لِلْكُفَّارِ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ

'কালবী বলেন, কাফেরদের মুর্তি রক্ষনাবেক্ষণ ও উপাসনালয়ের খাদেম হিসেবে যারা দায়িত্বরত ছিল, তারাই কাফেরদের জন্য নিজেদের সন্তান হত্যাকে বৈধ বানিয়ে দিত।'

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ধারকবাহক ও প্রতিবেশীরাও আজ নিজেদের সুযোগ-সুবিধা জন্য নিজেরাই একটি নতুন ধর্ম বানিয়ে নিয়েছে। যার রয়েছে আলাদা ফরয-ওয়াজিব। (যা পালন করা প্রত্যেক নাগরিকের জন্য আবশ্যক)। রয়েছে হালাল-হারাম (বৈধ-অবৈধ), মুস্তাহাব-মাকরূহ।

এটি কি আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন সাধন নয়? যেমনটি সূরা নিসার ১১৯ নং আয়াতে উল্লেখ হয়েছে- (অভিশপ্ত শয়তান আল্লাহকে বলেছিল...)

﴿ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ﴾

"আমি নিশ্চিতভাবে তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, তাদেরকে আশ্বাস দেব; তাদেরকে পশুদের কর্ণ ছেদন করতে বলব এবং তাদেরকে আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করতে আদেশ দেব। যে কেউ আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে পতিত হয়।"

এ আয়াতে وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ (শয়তান বলেছে) অবশ্যই আমি তাদেরকে হুকুম দেব, তখন তারা আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন সাধন করবে। এখানে আগেকার যুগের

মুফাসসিরগণের মতে, خَلْقَ اللهِ দ্বারা আল্লাহর ধর্মই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তারা আল্লাহর হারামকৃত বস্তুকে হালাল (বৈধ) এবং হালালকৃত বস্তুকে অবৈধ বা হারাম করার মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীনকে পাল্টে ফেলবে।

কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী রহ. তাফসীরে মাজহারীতে বলেন, শয়তান যেন তার কথার মাধ্যমে ইঙ্গিত করেছে যে, আমার আদেশ মতে, তারা আল্লাহর হালালকৃত বস্তুকে হারাম করবে। যে সব জন্তু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পূর্ণতা দিয়ে সৃজন করা হয়েছে, তাকে অপূর্ণাঙ্গ বানিয়ে দেবে।

নিঃসন্দেহে আইন প্রণয়নের অধিকার আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য নির্দিষ্ট করা এমন কুফরী, যেটা থেকে ফিরে আসতে যুগে যুগে নবীগণ দাওয়াত দিয়ে গেছেন। আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে বলেন-

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ﴾

“আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুত থেকে নিরাপদ থাকো। অতঃপর তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে আল্লাহ হিদায়াত দিয়েছেন এবং কিছু সংখ্যকের জন্য বিপদগামীতা অবধারিত হয়ে গেল।” ¬

গণতন্ত্র ও আকাবির উলামাদের ব্যাপারে আলোচনা

গনতন্ত্র সত্য হওয়ার পক্ষে একটি দলিল পেশ করা হয় যে, এটি যদি বাতিল হতো; তাহলে অনেক বড় বড় আকাবির উলামারা কেন তাতে জড়িয়েছেন?

এ ব্যাপারে আমরা আগেও আলোচনা করেছি যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকারীদের শক্তি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে কোনো ধারণাই ছিল না; বরং তা এমন এক শয়তানি ব্যবস্থা; তাতে যত চিন্তা করা হয়, তত প্রতারণা আবিষ্কৃত হয়। তত তাদের জন্য বদ-দুআ নির্গত হয়।

এ লোকগুলো ইসলাম, শরীয়াহ, আকায়েদ ও ফিকহে ইসলামীর গভীর জ্ঞান রাখতো। প্রাথমিক যুগে ইংরেজরা গণতন্ত্রকে এমনভাবে চালু করার প্রয়াস চালিয়েছে, যেমনটি এটিকে পশ্চিমে চালু করার জন্য করেছিল। কিন্তু শুধু উলামা কেন, সাধারণরাও একথা ভালোভাবে জানত যে, আইন প্রণয়নের সর্বোচ্চ ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য মানা, বা আইন প্রণয়নের অধিকার আল্লাহ ছাড়া কাউকে দেওয়া- এটি শুধু কবীরা গোনাহই নয়; বরং কুফর। তাই এ প্রয়াস মুসলিম বিশ্বে প্রথম চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছে।

এরপর মুসলিম বিশ্বের জন্য এ সংশোধিত সংস্করণ পাঠানো হয়েছে, যাতে ইসলামী পরিভাষাসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো, সেটিকে ইসলামঘনিষ্ঠ প্রমাণিত করা।

তাই যেসব আলেম তাতে অংশ নিয়েছেন, তাদের সেই ভালো উদ্দেশ্যে ছিল, তারা এ ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশে শরীয়াহ আইন বাস্তবায়ন করবেন। কিন্তু সেটিকে কাছ থেকে ভালোভাবে

দেখার পর এবং যাদের হাতে এ ব্যবস্থার চাবি রয়েছে, তাদেরকে ভালোভাবে বুঝার পর, সেসব উলামাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এটি নিছক প্রতারণা।

তাছাড়া আরও একটি ঐতিহাসিক সত্য সামনে রাখা আবশ্যক, সেই আকাবির উলামার সাথে তখনকার নেতারা দিনরাত ওয়াদা করত যে, আমরা দেশে শরীয়াহ আইন বাস্তবায়ন করব। এটির ওপর ভিত্তি করেই উলামারা এ ব্যবস্থায় অংশ নিয়েছেন। তো এখন যদি সেই নেতারা প্রতারণা করে, উলামাদের দোষ কী?

তাই জ্ঞানীদের জন্য এটা সাজে না যে, এটিকে গণতন্ত্রের সত্যতার পক্ষে দলিল পেশ করে এমনভাবে বলা যে, গণতন্ত্র ভুল হলে আকাবিরগণ তা করতেন না।

এটি ভুল যে, নেতাদের শক্তির ভয়ে আপনারা কোনো দলিল ছাড়া সেই কুফরকে ইসলাম প্রমাণ করবেন এবং দলিলে আকাবিরদের নাম ব্যবহার করবেন। (আপনাদের কি এ অধিকার আছে?) তেমনি এটাও ভুল যে, এ গণতন্ত্রে অংশ নেওয়ার ফলে কোনো অতি উৎসাহী সেসব উলামাকে কাফির বলে দেবেন। মধ্যমপন্থা হলো, এসব আলেমকে অপারগ মনে করা হবে এবং গণতন্ত্রের কুফরী মানুষের সামনে স্পষ্ট করে দেওয়া হবে।

৩. আল্লাহ কর্তৃক অবৈধ ও হারামকৃত বস্তুকে বৈধ ও হালাল বানানো এবং অবশ্য পালনীয় ফরযকে হারাম ও অবৈধ বানানো:

এ জাহেলী ব্যবস্থায় একটি বড় শরীয়াহবিরোধী কাজ হলো, নিজেরাই যা ইচ্ছা বৈধ সাব্যস্ত করে, আর যা ইচ্ছা অবৈধ সাব্যস্ত করে। অথচ এ অধিকার আল্লাহ কাউকে দেননি।

﴿ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾

“আর তারা বলে, এসব চতু®পদ জন্তু ও শস্যক্ষেত্র নিষিদ্ধ। তাদের ধারণা এমন যে, আমরা যাকে ইচ্ছা করি, সে ছাড়া এগুলো কেউ খেতে পারবে না। আর কিছু সংখ্যক চতুষ্পদ জন্তুর পিঠে আরোহণ হারাম করা হয়েছে এবং কিছু সংখ্যক চতু®পদ জন্তুর ওপর তারা ভ্রান্ত ধারণাবশত আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে না, তাদের মনগড়া বুলির কারণে, অচিরেই তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন।”

আফসোস! এ গণতান্ত্রিক কুফরী ব্যবস্থাকে ইসলামী প্রমাণ করার জন্য শেষমেষ সেই কথাই বলা হয়, যা কুফফারে মক্কা দলিল দিতে ব্যর্থ হয়ে বলত-

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴾

“মুশরিকরা বলল, যদি আল্লাহ চাইতেন; তবে আমরা তাঁকে ছাড়া কারো ইবাদত করতাম না এবং আমাদের পিতৃপুরুষেরাও করত না এবং তাঁর নির্দেশ ছাড়া কোনো বস্তুই আমরা হারাম করতাম না। তাদের পূর্ববর্তীরা এমনই করেছে। রাসূলের দায়িত্ব তো শুধুমাত্র সু¯পষ্ট বাণী পৌঁছিয়ে দেওয়া।”

৪. অসৎকর্মে আদেশ এবং সৎকর্মে বাধাপ্রদান

এ ব্যবস্থায় এ কাজটি রাষ্ট্রের ছত্রছায়ায় করা হয়। আল্লাহ তাআলা সূরা তাওবায় বলেন-

﴿ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾

"মুনাফিক নর-নারী সবারই গতিবিধি একরকম; তারা মন্দ কাজের আদেশ করে, ভালো কাজ থেকে বারণ করে এবং নিজ মুঠো বন্ধ রাখে। তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, কাজেই তিনিও তাদের ভুলে গেছেন। নিঃসন্দেহে মুনাফেকরা ঘোর অবাধ্য।"

খেলাফতে উসমানিয়ার ধ্বংসের পর পৃথিবীর বুকে আল্লাহর শরীয়ত পুরোপুরি শাসিত ও পরাভূত হয়ে গেছে। মুসলিম ভূখ-সমূহে শরীয়াহব্যবস্থা শেষ করে দিয়ে ইংরেজি, ফরাসি ও অন্যান্য মিশ্র ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫ খৃ.) পর সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো যখন নিজেদের অধীনস্থ মুসলিম দেশগুলো ত্যাগ করছিল, তখন তারা খুব ভালোভাবেই খেয়াল রেখেছে যে, তাদের চলে যাওয়ার পরও যাতে কোনো ভূখণ্ডে মুহাম্মাদ ﷺ এর শরীয়াহ বাস্তবায়িত হতে না পারে। তাই অধিকাংশ মুসলিম দেশে গণতন্ত্র চালু করা হয় এবং এ কথা আবশ্যক করে দেওয়া হয় যে, কোনো মুসলিম দেশে শরীয়াহ চালু করা যাবে না। এ লক্ষ্যে জাতিসংঘের চার্টারকে জীবনব্যবস্থা (ধর্ম) হিসেবে প্রত্যেক রাষ্ট্রের জন্য বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়েছে। সরকারগুলো এসব কানুন গুরুত্বের সাথে বাস্তবায়ন করছে। রাষ্ট্রের পুলিশবাহিনী তা বাস্তবায়নে মাঠে নেমেছে।

ফলে মুসলিম সাম্রাজ্য থেকে ইসলামের কর্তৃত্ব শেষ হয়েছে। যে ব্যবস্থা মানুষের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, যার পোশাকটি নতুন হলেও তার বাস্তবতা ফেরআউন, নমরুদ, সামিরী, শাদদাদ, আবু লাহাব ও আবু জাহেলদের মতোই ছেঁড়া ও পুরাতন। আসলে এ জীবনব্যবস্থা হলো, সেই পুরানো জাহিলিয়্যাতের নতুন সংস্করণ। এটির কর্তৃত্বকালীন মানুষ শুধু পাপাচারেই লিপ্ত হয় না; বরং পাপাচার প্রসার করার দাওয়াত, তার প্রতি অনুরাগ ও উৎসাহিতকরণ এবং পাপাচারের সব উপকরণ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় যোগাড় করা হয়। পাপাচারের অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার দাওয়াত, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এগুলোর প্রচার ও সুরক্ষাদান রাষ্ট্রের দায়িত্ব সাব্যস্ত হয়। সুদের ভাগাড় (ব্যাংক) হোক বা বেহায়াপনার আখড়া (মালিশকেন্দ্র, সিনেমাহল, ক্যাবল, টিভি, ইন্টারনেট, ক্যাফে ইত্যাদি) হোক বা গানবাজনার অনুষ্ঠান হোক- এদের কারো কোনো আশঙ্কা হলে রাষ্ট্রের আইনকৃংখলা বাহিনী তাদের নিরাপত্তা দেওয়াকে নিজেদের ওপর ফরয মনে করে। এমন মুহূর্তে কোনো ঈমানদার পাপাচার রুখতে ওঠে দাঁড়ালে তাকে লাল-মাসজিদ ও জামিয়া হাফসার মতো টার্গেট করা হয়।

মুহাম্মাদ ﷺ এর শরীয়তকে রুখার জন্য রাষ্ট্রের সব শাখা (সরকার, প্রশাসন, বিচারবিভাগ, গণমাধ্যম) নিজেদের মতো করে কাজ করে যাচ্ছে। তেমনিভাবে ইসলাম সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করা, ইসলামের নিদর্শনাবলি (দাড়ি, টুপি, হুদূদ-কিসাস ইত্যাদি) কে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করা, উম্মাহকে জিহাদ থেকে দূরে সরানোর বিভিন্ন পায়তারা করা, মাদরাসা, উলামা ও দ্বীনিশিক্ষার প্রতি ঘৃণা ছড়ানো ওদের মৌলিক মিশনের অন্তর্ভুক্ত।

৫. সুদব্যবস্থার জয়জয়কার

কুরআন-হাদীসের অসংখ্য স্থানে সুদের দুর্নাম করা হয়েছে। এটিকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ অবহিত করা হয়েছে। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা, হোক সেটা জাতীয় বা আন্তর্জাতিক, এটি সুদব্যবস্থার ওপরই দাঁড়িয়ে আছে। অর্থাৎ গণতন্ত্র হোক বা রাজতন্ত্র, দারুল আমান হোক বা দারুল হারব, এ সময়ের যেসব দেশ জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত, সব দেশই সুদের সাথে জড়িত। যেন বিশ্বব্যবস্থা প্রত্যেক রাষ্ট্রের জন্য সুদকে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। আর সব রাষ্ট্রই জনগণের ওপর বিভিন্ন করারোপ করে সেই সুদ সংগ্রহ করে। করের নামে দেশে দেশে যে পরিমাণ টাকা উত্তোলন করা হচ্ছে, এর একটি বিশেষ অংশ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্থাগুলোর কাছে কিস্তি আকারে পৌঁছে যাচ্ছে।

আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন-

﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾

“তবু যদি তোমরা পরিত্যাগ না করো; তবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও। কিন্তু যদি তোমরা তওবা করো; তবে তোমরা নিজের মূলধন পেয়ে যাবে। তোমরা কারও প্রতি জুলুম করো না এবং কেউ তোমাদের প্রতি জুলুম করবে না।”

﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾

“যারা সুদ খায়, তারা কিয়ামতে দ-ায়মান হবে, যেভাবে দ-ায়মান হয় ঐ ব্যক্তি, যাকে শয়তান আছর করে মোহাবিষ্ট করে দেয়। তাদের এ অবস্থার কারণ এই যে, তারা বলেছে, ক্রয়-বিক্রয়ও তো সুদ নেওয়ারই মতো! অথচ আল্লাহ তাআলা ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধ করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।”

নবী কারীম ﷺ কতই না শক্তভাবে সুদের তুলনা বর্ণনা করেছেন-

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرِّبَا اثْنَانِ وَسَبْعُونَ بَابًا، أَدْنَاهَا مِثْلُ إِتْيَانِ الرَّجُلِ أُمَّهُ، وَأَرْبَى الرِّبَا اسْتِطَالَةُ الرَّجُلِ فِي عِرْضِ أَخِيهِ

হযরত বারা ইবনে আযিব রাযি. বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, “সুদের রয়েছে বাহাত্তরটি দরজা। এর সবচেয়ে ছোট দরজা হলো, নিজের মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার মতো। আর সবচেয়ে বড় সুদ হলো, কোনো ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের সম্মানহানি করবে।”

عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হানজালা (যাকে ফেরেশতাগণ গোসল দিয়েছিলেন) বলেন, “রাসূল ﷺ বলেন, এক টাকা সুদও যদি কেউ জেনেবুঝে খায়, তা ছত্রিশবার ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে মারাত্মক।”

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

হযরত জাবের রাযি. বলেন, রাসূল ﷺ অভিশাপ দিয়েছেন সুদদাতা, সুদগ্রহীতা, সুদলেখক, সুদের সাক্ষ্যদাতার ওপর। বলেছেন, এরা সবাই সমান (অপরাধী)।

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمُ الرِّبَا، إِلَّا أُخِذُوا بِالسَّنَةِ، وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمُ الرُّشَا، إِلَّا أُخِذُوا بِالرُّعْبِ

হযরত আমর ইবনুল আস রাযি. বলেন, আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, “যে জাতির মধ্যেই সুদ ব্যাপক আকার ধারণ করে, তারা দুর্ভিক্ষের শিকার হয়। যে জাতির মধ্যে ঘুষ ব্যাপক হয়ে যায়, তারা ভয়ের শিকার হয়।”

সুতরাং প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনার মতামত কী? যেটি সুদি ব্যবস্থার ওপর দাঁড়িয়ে আছে; বরং এর গভীরে যাওয়ার পর মনে হয় যে, এটির মৌলিক উদ্দেশ্যসমূহের অন্যতম হলো, সুদের লেনদেন থেকে মানুষ যেন বাঁচতে না পারে। তাই তো একদম নি¤œস্তর পর্যন্ত সুদের কারবার।

আপনারা দেখছেন, সুদি কারবার শুধু ব্যক্তিগত পর্যায়ে নয়, রাষ্ট্রীয়ভাবে সুদি কারবারকে শুধু বৈধই বলছে না; বরং অনেক কাজের মধ্যে তা আবশ্যক করে দেওয়া হয়েছে। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় মানুষ সুদে জড়িত হচ্ছে।

৬. জোরপূর্বক করারোপ

আল্লাহর সৃষ্টি থেকে কর আদায় করা সুদের চেয়েও মারাত্মক গোনাহ বলে সাব্যস্ত করেছেন উলামায়ে কেরাম। কিন্তু বিশ্বকুফরী ব্যবস্থা প্রত্যেক রাষ্ট্রকে (গণতন্ত্র হোক বা রাজতন্ত্র) তার নাগরিকদের কাছ থেকে জোরপূর্বক কর আদায় করতে বাধ্য করছে। রাষ্ট্রীয় সুদি লেনদেনের ঋণের বোঝা জনগণের করের টাকা দিয়েই পরিশোধ করা হয়। এভাবে তাতে উভয় ধরনের নোংরামি ও জুলুম একত্রিত হয়ে যায়।

ইমাম হাকিম রেওয়ায়েত করেন-

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَا يَدْخُلُ صَاحِبُ مَكْسٍ الْجَنَّةَ

উকবা ইবনে আমের রাযি. বলেন, আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, “কর আদায়ে জুলুমকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।”

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় কাযী ইয়াজ রহ. বলেন-

وقوله: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له : فيه دليل على عظيم ذنب صاحب المكس

রাসূল ﷺ বলেছেন, “গামিদিয়াহ রাযি. এমন তাওবা করেছেন, যদি কর আদায়কারীরাও এমন তাওবা করে, তবে তাদেরকেও মাফ করে দেওয়া হবে।” কর আদায় বড় গোনাহ হওয়ার এটি একটি দলিল ।

ইমাম আবুবকর জাসসাস রহ. বলেন-

وَكَذَلِكَ حُكْمُ مَنْ يَأْخُذُ أَمْوَالَ النَّاسِ مِنْ الْمُتَسَلِّطِينَ الظَّلَمَةِ وَآخِذِي الضَّرَائِبِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ الْمُسْلِمِينَ قِتَالُهُمْ وَقَتْلُهُمْ إذَا كَانُوا مُمْتَنِعِينَ، وَهَؤُلَاءِ أَعْظَمُ جُرْمًا مِنْ آكِلِي الرِّبَا لِانْتِهَاكِهِمْ حُرْمَةَ النَّهْيِ وَحُرْمَةَ الْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا. وَآكِلُ الرِّبَا إنَّمَا انْتَهَكَ حُرْمَةَ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَخْذِ الرِّبَا وَلَمْ يَنْتَهِكْ لِمَنْ يُعْطِيهِ ذَلِكَ حُرْمَةً، لِأَنَّهُ أَعْطَاهُ بِطِيبَةِ نَفْسِهِ. وَآخِذُو الضَّرَائِبِ فِي مَعْنَى قُطَّاعِ الطَّرِيقِ الْمُنْتَهِكِينَ لِحُرْمَةِ نَهْيِ اللَّهِ تَعَالَى وَحُرْمَةِ الْمُسْلِمِينَ; إذْ كَانُوا يَأْخُذُونَهُ جَبْرًا وَقَهْرًا لَا عَلَى تَأْوِيلٍ وَلَا شُبْهَةٍ، فَجَائِزٌ لِمَنْ عَلِمَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إصْرَارَ هَؤُلَاءِ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَخْذِ أَمْوَالِ النَّاسِ عَلَى وَجْهِ الضَّرِيبَةِ أَنْ يَقْتُلَهُمْ كَيْفَ أَمْكَنَهُ قَتْلُهُمْ، وَكَذَلِكَ أَتْبَاعُهُمْ وَأَعْوَانُهُمْ الَّذِينَ بِهِمْ يَقُومُونَ عَلَى أَخْذِ الْأَمْوَالِ

‘এবং যেভাবে সুদের কারবারীদের সাথে ঐ সময় যুদ্ধ করা হবে, যখন তারা ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধানের নিয়ন্ত্রণ থেকে বের হয়ে একটি শক্তিশালী গ্রুপে রূপ লাভ করবে। তেমনি সেসব মানুষের হুকুমও একই, যারা মানুষ থেকে জোরপূর্বক অর্থ আদায় করে এবং করারোপ করে। যখন তাদের শক্তির কারণে তাদের ওপর ইসলামী আইনপ্রয়োগ করা সম্ভব হয় না, তখন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং তাদেরকে হত্যা করা প্রত্যেক মুসলমানদের জন্য ফরয। এরা তো সুদি কারবারিদের চেয়েও বড় অপরাধী। কারণ, আল্লাহ তাআলার হারামকৃত হুকুমকে তারা পদদলিত করে এবং মুসলমানদের সম্মানকেও পদদলিত করে। সুদ করবারিরা তো শুধু আল্লাহর হুকুমই পদদলিত করে। কিন্তু সুদগ্রহীতা দাতার সম্মানে আঘাত করে না; বরং সুদদাতা সন্তুষ্ট হয়েই সুদ দেয়। কর আদায়কারীরা ডাকাতের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, তারা আল্লাহর হুকুমকে যেমন অসম্মান করে, তেমনি মুসলমানদেরকেও অসম্মান করে। কারণ, তারা শক্তির বলে জোরপূর্বক কোনো ব্যাখ্যা ছাড়া মুসলমানদের সম্পদ উসুল করে। সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য বৈধ হলো, যেভাবে হোক তাদেরকে হত্যা করা। যে মুসলমানই এ

কথা জানবে যে, সে জোরপূর্বক মানুষের কাছ থেকে কর আদায় করছে এবং তেমনিভাবে তার সহযোগীদেরকেও হত্যা করা বৈধ।'

৭. বেহায়াপনা

এ সময়ের জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রগুলোতে (মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হোক বা কাফের সংখ্যাগরিষ্ঠ) যে জীবনধারা প্রচলিত আছে, তার বাস্তবতা অনুধাবনকারীর জন্য এ কথা বুঝা মোটেও কঠিন নয় যে, এ পুরো ধারাটিই প্রবৃত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এ জীবনব্যবস্থার বাগডোর না; বরং শাহরগ যাদের (কর্পোরেট, বিশ্বব্যাংক ও মাল্টিন্যাশনাল) হাতে, তাদের প্রথম উদ্দেশ্যই হলো, মুসলমানদেরকে নয় শুধু, পুরো মানবতাকে বেহায়াপনার গর্তে নিক্ষেপ করা, যেখানে মানবতা লজ্জিত। এ পর্যায়ে মানুষকে দেখে ইবলিশ খুবই আনন্দিত হয়।

ইসলাম বিজয়ী হওয়ার অবস্থায় শরীয়াহব্যবস্থা যে স্পর্শকাতর বিষয়টির প্রতি (দমনের লক্ষ্যে) সবচেয়ে খেয়াল রাখে, তা হলো বেহায়াপনা। এর সূক্ষ্মানুভূতি এ কথার দ্বারা স্পষ্ট যে, ব্যভিচার একজন মানুষ গোপনভাবেই করে। যদি সাক্ষী না থাকে এবং সে নিজেও তা স্বীকার না করে, তখন আলামত পাওয়া যাওয়া সত্ত্বেও তাকে শরীয়াহ শাস্তি দেয় না। অথচ অপরাধ তো সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু এ অপরাধ যদি খোলামেলা পরিবেশে করার চেষ্টা করা হয়, তখন এর শাস্তি খুবই কঠিন।

বুঝা গেল, শরীয়াহর কাছে গোনাহর প্রসার করা গোনাহ করার চেয়ে মারাত্মক।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

"নিশ্চয়ই যারা পছন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে ব্যভিচার প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্য ইহাকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।"

বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে যেহেতু এলিটশ্রেণীর প্রবৃত্তিই আসল, তাই বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার প্রসার ঘটাতে রাষ্ট্র সাধ্যের সবটুকু ঢেলে দেয়। বেহায়াপনার খবরসমূহ নতুন নতুন মোড়কে প্রচার করা হচ্ছে, যা দেখে আশ্চর্য না হয়ে কোনো উপায় নেই। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্তম্ভ এ বেহায়াপনা শয়তানের ইচ্ছার যেন জ্যান্ত প্রতিচ্ছবি।

বেহায়াপনা ও অশ্লীলতা ছড়ানোর কত যে গুরুত্ব এ ব্যবস্থায়, তা আপনি এ কথা থেকে আন্দাজ করতে পারবেন যে, কোনো ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান যদি ঘরে ঘরে সংযোগ দেওয়া ক্যাবল তারগুলো কাটার চেষ্টা করে, অথবা নাচগান ও নাইট ক্লাবগুলো বন্ধ করতে চায় এবং এ লক্ষ্যে ঈমানী আত্মমর্যাদার সর্বোচ্চ স্তর 'হাত' ব্যবহার করে, তখন রাষ্ট্র তাঁকে কেমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেবে? রাষ্ট্রের আইনকৃংখলা বাহিনী (তাঁর বিরুদ্ধে) পদক্ষেপ নেবে। সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হবে। লাল-মাসজিদ ট্র্যাজেডি আপনাদের সামনে আছে। তাঁদের অপরাধ ছিল, তাঁরা এ নাপাকি থেকে সমাজকে বাঁচাতে চেয়েছেন, যা দেশের রাজধানীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। এমনকি এমন ঘটনা ঘটছিল, যা শুনে মেজাজ ঠিক রাখা মুশকিল ছিল। বাপ-মেয়ে, ভাইবোনের পার্থক্য শেষ হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু রাষ্ট্র এসবের প্রতি রুষ্ট হয়নি। রুষ্ট হয়েছে সেই নষ্টামি প্রতিহতকারী ধার্মিকশ্রেণীর কিছু নিরীহ ছাত্রছাত্রীর প্রতি।

ধার্মিক ধনীশ্রেণীকে এ কথা ভালো করে বুঝে নিতে হবে যে, বেহায়াপনা এ ব্যবস্থায় লাইফস্টাইল হিসেবে অন্তর্ভুক্ত। প্রবৃত্তির কামনাবাসনার পূর্ণতাদানে মেয়েদের পর্যন্ত পৌঁছতে ছেলেদের জন্য যেসব প্রতিবন্ধকতা আছে, তা শেষ করে দেওয়া জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বকুফরী ব্যবস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য। আর জাতীয়তাবাদী সরকারগুলো তো জাতিসংঘেরই অনুগত।

সুতরাং কোনো শক্তি আল্লাহর হুকুম সৎকর্মের আদেশ ও অসৎকর্মের নিষেধ করবে এবং নিজের চোখের সামনে ঘটমান হারামকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে শক্তিপ্রয়োগ করবে, তা কখনো রাষ্ট্র বরদাশত করবে না।

সার কথা

এ তো অল্প কিছু মন্দ দিক আলোচনা করা হয়েছে, না হয় এ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ঘটে না- এমন আর কী বাকি আছে?

এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে, সমাজে বিভিন্ন আন্দোলন জোরদার হওয়া সত্ত্বেও সমাজে পাপাচার কেন বেড়ে চলছে? অর্থাৎ একদিকে আমরা ধর্মীয় আধ্যাত্মিক শক্তিগুলো (তাবলীগ জামাত, মাদরাসা, খানকা) কে যখন দেখি, তো আল-হামদুলিল্লাহ খুশিতে হৃদয় নেচে ওঠে। ফেতনাভরা এ যুগে কত কষ্ট করে দিনরাত মেহনতের মাধ্যমে জাতিকে ইসলামের বাণী পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। এমন এক পরিস্থিতির মাঝে, যখন রাষ্ট্র নয় শুধু, আন্তর্জাতিকভাবে

পাপাচারের পৃষ্ঠপোষকতা করা হচ্ছে। এ দ্বীনি শক্তিগুলো বড় বড় শহরে যুবকদেরকে ইসলামের রঙে রাঙিয়ে দিচ্ছে।

কিন্তু এসব কিছুর পরও সমাজে সামগ্রিকভাবে বেহায়াপনা বেড়েই চলছে। অর্থাৎ যে মন্দ কাজকে কালও ধার্মিকরা ফেতনা মনে করত; কিন্তু আজ অনেক ধার্মিক বা তাদের সন্তানরাও তাতে জড়িয়ে পড়ছে।

এর কারণ স্পষ্ট, যে ব্যবস্থা বিজয়ী থাকবে, তারই জীবনধারা বিজয়ী থাকবে। সেই ব্যবস্থার ছায়াতলে থেকে যতই সংশোধনের চেষ্টা করা হোক না কেন। আল্লাহ তাআলা এ বাস্তবতা ভালোভাবেই জানেন। তাই কুফরের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার আগেই তিনি তা ভেঙে দিতে বলেছেন-

﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ ﴾

“শরীয়াহ’র দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যতক্ষণ না ফেতনা নির্মূল হয়।”

সুতরাং যতদিন ফেতনা তথা গাইরুল্লাহ’র মতবাদ বিদ্যমান থাকবে, ততদিন মুহাম্মাদ ﷺ এর শরীয়াহ বাস্তবায়িত হবে না। তাই প্রথমে সেই শক্তিকে ভেঙে দিতে বলা হয়েছে, যা এসব নষ্টামির পৃষ্ঠপোষকতা করছে। আপনি সুদের বিরুদ্ধে যত কর্মশালাই করুন না কেন, যত তাবলীগ করুন না কেন। কিন্তু যখন রাষ্ট্র স্বীয় শক্তিবলে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুদকে আবশ্যক করে দেয় এবং তা আদায় করা রাষ্ট্রীয়ভাবে ফরয করে দেয়, তখন তার বিরোধিতা রাষ্ট্রদ্রোহিতা নামেই অবিহিত হয়। তাই মুসলমানদের ইচ্ছায় অনিচ্ছায় এ সুদি কারবারে জড়াতে বাধ্য করা হচ্ছে, যাতে তারা সুদি লেনদেনে জড়িয়ে কামাই রুজি করে।

অনেকে মনে করেন, সুদ পাকিস্তান বা অন্য যে কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়। তাই চাইলে তা শেষ করে দেওয়া যাবে। বিশ্বব্যবস্থা ও জাতিসংঘের নিয়মকানুন বুঝতে ভুল করার কারণেই এমন ধারণা হতে পারে। দেশীয় সরকারের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে বিশ্বকুফর সরকার। তা সব দেশকে আন্তর্জাতিক আইন মানতে বাধ্য করছে। তাই জিহাদ ছাড়া শুধু বুঝিয়ে এসব পরিবর্তন করা অসম্ভব। তাই সর্বপ্রথম সেই হাত ভাঙতে হবে, যা পুরো পৃথিবীকে জিম্মি বানিয়ে রেখেছে। সুদ ছাড়া জীবনোপকরণ অসম্ভব করে দিয়েছে।

পাপাচারের সহায়ক শক্তিগুলো যতদিন বিদ্যমান থাকবে, ততদিন সেই পাপাচারের জোর ভাঙা যাবে না। সেই শক্তিকে প্রথমে ভেঙে দিলে এমনিতেই পুরো পরিস্থিতি আল্লাহর আইনের নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। আগে কুফরীশক্তিকে ভেঙে দেওয়া ব্যতীত পুরো পরিবেশ দ্বীনমুখী হয়ে যাওয়া অসম্ভব।

আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়িত না হওয়ার শাস্তি

আল্লাহর নিয়ামতসমূহ থেকে বিতাড়ন ও বঞ্চিতকরণ:

﴿ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾

“নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মাঝে নিপতিত”

এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন-

﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾

“আর স্মরণ করো! যখন তোমাদের প্রভু ঘোষণা করলেন, “তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো; তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের জন্য (নেয়ামতরাজি) বাড়িয়ে দেব। কিন্তু তোমরা যদি অকৃতজ্ঞ হও; তাহলে আমার শাস্তি নিশ্চয়ই অত্যন্ত কঠোর।”

উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার দ্বারা নেয়ামত বৃদ্ধির অঙ্গীকার করেছেন এবং অকৃতজ্ঞ হওয়াকে ঐ নেয়ামত ছিনিয়ে নেওয়ার কারণ হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন।

কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা একটি গ্রামের উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেছেন-

﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ
فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾

“আর আল্লাহ একটি উপমা বর্ণনা করেন- একটি শহর যা নিরাপত্তায় ও নিশ্চিন্তে ছিল, এর রিযিক সবদিক থেকে প্রচুর পরিমাণে এর কাছে আসত, তারপর আল্লাহর অনুগ্রহাবলি সম্বন্ধে সে অকৃতজ্ঞ হলো, কাজেই তারা যা করে চলেছিল সেজন্য আল্লাহ তাকে আস্বাদন করালেন ক্ষুধার আবরণ দিয়ে ও ভয় দিয়ে।”

যদি আল্লাহর তাআলার সাথে কাউকে শরীক করা হয়; তাহলে আল্লাহ তাআলা আখিরাতের সাথে সাথে দুনিয়াও তার জন্য সংকীর্ণ করে দেন। যে দুনিয়ার জন্য সে আল্লাহ তাআলার সাথে শিরক ও কুফরে লিপ্ত, সে দুনিয়াতেই আল্লাহ তাআলা তার ওপর ক্ষুধা-পিপাসা, সংকীর্ণতা, দেউলিয়াত্ব ও ভয়-ভীতি চাপিয়ে দেন।

যে ভূমিতে যে পরিমাণ আল্লাহ তাআলার অবাধ্যাচরণ করা হয়, সে ভূমি সে পরিমাণ উৎপাদিত ফসলাদি ও তার বরকত রুখে রাখে। আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে বড় অবাধ্যাচরণ হলো, আল্লাহ তাআলার ভূমিতে তাঁর বিধান বাস্তবায়নের অধিকারেরই সমাপ্তি ঘটানো এবং তার সাথে কুফরী করাকে রাষ্ট্রের সার্বিক নেযাম বানিয়ে দেওয়া।

অতএব, আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধানের সাথে বিদ্রোহ ও অবাধ্যাচরণ এবং স্বীয় বানানো আইনের ওপর একগুঁয়ে হয়ে অটল থাকার পরিণাম এ ছাড়া আর কী হতে পারত যে, আসমান ও জমিন উভয়ই রাগ ও ক্ষোভে ফেটে পড়ত। আসমান তার বারি বর্ষণ বন্ধ করে দিত আর জমিন তার বরকতসমূহ আটকে রাখত।

আর হ্যাঁ, বর্তমান পৃথিবীর অবস্থাও তাই।

সুবহানাল্লাহ! কুরআনে কারীমের একেকটি আয়াত আজ এ আধুনিক বিশ্বের জন্য চ্যালেঞ্জ। সূরা আ'রাফের ৫৮ নং আয়াত দেখে তো মনে হয় যে, আজই এ নেযামের ব্যাপারে এ আয়াত তাজা তাজা অবতীর্ণ হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

﴿ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴾

“আর ভালো জমি, এর গাছপালা গজায় তার প্রভুর অনুমতিক্রমে। আর যা মন্দ, কিছুই গজায় না অল্পস্বল্প ছাড়া। এভাবে আমি নির্দেশনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি, যারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সেসব লোকের জন্য।”

এ আয়াতের মাঝে বলা হয়েছে যে, ভালো জমি শস্য ও ফসলাদি উৎপন্ন করে তার রবের হুকুমে। আর মন্দ জমি বা অনুর্বর ভূমি থেকে অল্পস্বল্প ছাড়া কিছুই গজায় না।

ইমাম ওয়াহিদী ও ইমাম রাযী রহ. نَكِدًا এর ব্যখ্যায় লিখেছেন-

النكد: العسر الممتنع من إعطاء الخير علي جهة البخل

অর্থাৎ, ‘কৃপণতার কারণে ভালো কোনো জিনিস (সম্পদ ব্যয় করা) প্রদান করা থেকে অপ্রতিরুদ্ধ বাধা।’

পূর্বোক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ মানুষের অন্তরের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। মানুষের অন্তরের ব্যাপারে নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন-

ان العبد اذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فاذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، وان عاد زيد فيها حتي تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله ﴿ كَلَّا ۖ بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾

“নিশ্চয়ই বান্দা যখন কোনো গুনাহ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। অতএব, যদি সে তাওবাহ ও ইস্তেগফার করে, তখন তার অন্তর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। যদি পুনরায় সে গুনাহর দিকে ফিরে আসে; তাহলে ঐ দাগ বাড়তে থাকে যে পর্যন্ত না, তা তার অন্তরে পরিপূর্ণ সংক্রমিত হয়ে পড়ে। আর এর নামই হলো রা’ন (জং ও মরচে) যেটা আল্লাহ তাআলা সূরা মুতাফফিফীনে উল্লেখ করেছেন- “না, কখনো নয়; বরং তারা যা অর্জন করে চলেছিল, তা তাদের হৃদয়ে মরচে ধরিয়েছে।”

অতঃপর, এমন এক সময় আসে যে, পুরো অন্তর ঐ জমিনের মতো হয়ে যায়; যাকে নিমকগুল্ম খেয়ে ফেলেছে। ফলে সেটা অনুর্বর ও বিরান ভূমিতে পরিণত হয়।

যেরূপ ভালো ও উৎকৃষ্ট অন্তর হচ্ছে সেটি যাতে আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা গালেব বা প্রবল থাকে। এ ধরনের অন্তর ওয়াজ-নসীহতের কারণে নরম ও বিগলিত হয়। ফলস্বরূপ, আমালে সালেহা বা নেক আমলসমূহ খুঁজে খুঁজে আদায় করা শুরু করে। অনুরূপ, ভালো ও পবিত্র ভূমি হচ্ছে সেটি, যেখানে আল্লাহ তাআলার দ্বীন গালেব বা বিজয়ী থাকে। ঐ ভূমিতে বসবাসকারী প্রত্যেকের চব্বিশ ঘণ্টা মহান আল্লাহর শরীয়তের ছায়ায় অতিক্রান্ত হয়, ইবাদতের ক্ষেত্রেও, মুআমালাতের ক্ষেত্রেও। যেখানে সুদভিত্তিক ব্যবস্থা চালু হবে না এবং বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার জয়গান থাকবে না। তাহলে, এ ধরনের ভূমি স্বীয় ফিতরাতের ওপর বিদ্যমান থাকে। যা মহান আল্লাহ প্রদত্ত বারি বর্ষণে সিক্ত হয় এবং তার অভ্যন্তর থেকে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য অঙ্কুরিত হয়।

যেরূপ কোনো অন্তরে যদি গাইরুল্লাহ’র মুহাব্বত গালেব বা প্রবল থাকে, যে অন্তরে খাহেশাত বা প্রবৃত্তির অনুস্বরণের প্রাধান্যতা বিদ্যমান থাকে, সে অন্তর খারাপ ও বরবাদ হয়ে যায়। স্বীয় ফিতরাত বা প্রকৃতি থেকে হটে যায়। ঠিক তদ্রƒপ, যে ভূমিতে কুফরের প্রাধান্যতা থাকবে, সেটিও স্বীয় ফিতরাত থেকে সটকে পড়বে। আর তখন, আকাশ থেকে বর্ষিত বৃষ্টিও আগাছা বৃদ্ধি করা ছাড়া কোনো উপকার করবে না।

যেমনিভাবে খারাপ অন্তর কল্যাণ ও খায়েরকে গ্রহণ করে না এবং ঐ কল্যাণবিহীন মন্দ জিনিসগুলোকেই গ্রহণ করে, তেমনি যে ভূমি খারাপ হয়ে যায়, সেখানে কাঁটাযুক্ত বৃক্ষেরই আধিক্য থাকে; যদিও অতি সামান্য ভালো গাছপালা উত্থিত হয়।

অতএব, একটু চিন্তা করুন! ঐ ভূমি থেকে নিকৃষ্ট ভূমি আর কোনটি হতে পারে; যাতে কুফরের কর্তৃত্ব ও প্রাধান্যতা বিদ্যমান থাকবে যে, প্রকাশ্যে আল্লাহ তাআলার সাথে কুফরী করা হয়ে থাকে। কুফরী জীবন বিধান তাতে প্রতিষ্ঠিত থাকে। মানবজাতির পারস্পরিক বিচারকার্য কুরআন ব্যতীত অন্য কোনো বানানো বিধান দ্বারা করা হয়। এবং আল্লাহর কালেমা বিজিত থাকে; তাহলে এ ধরনের ভূমি কি শস্য ও ফসলাদি দিতে পারে? কোনো ভূমি আল্লাহর শরীয়ত বাস্তবায়িত থাকাবস্থায় অনুর্বর ও বিরান ভূমিতে পরিণত হওয়া অনেক উত্তম ও মঙ্গলজনক ঐ ভূমি থেকে; যাতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) এর শরীয়ত ব্যতীত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত থাকে।

কোনো ভূমি ভালো ফসল ফলানো এবং ভালো ফসল দেওয়া থেকে বিরত থাকার আসল সম্পর্ক আল্লাহ তাআলার আনুগত্য ও অবাধ্যতার সাথে সম্পৃক্ত। আর আল্লাহ তাআলা'র সবচেয়ে বড় অবাধ্যতা হলো, তাঁর সাথে কুফরীতে লিপ্ত হওয়া। অতএব, যে ভূমিতে কুফর এবং কুফরী বিধানাবলি প্রতিষ্ঠিত থাকবে, সে ভূমির অবস্থা ব্যভিচার আর মদ্যপানে উন্মত্ত ভূমির চেয়েও ভয়াবহ হবে।

আর এসব ব্যাপারে কুরআনে কারীমের বিভিন্ন জায়গায় আলোকপাত করা হয়েছে, যে ভূমিতে আল্লাহর সাথে নাফরমানি করা হবে, সেসব ভূমির বরকত ওঠিয়ে নেওয়া হবে।

কৃষিক্ষেত্রে সব ধরনের অত্যাধুনিক আবিষ্কারের পরও বর্তমানে কৃষিক্ষেত্রে যে অবস্থা তা বিশ্বের সকলের সামনে স্পষ্ট। প্রাথমিকভাবে আবাদযোগ্য ভূমি থেকে ফসল উৎপাদনে কতই না কষ্ট স্বীকার করতে হয়। সর্বপ্রথম বীজের প্রতি মুখাপেক্ষিতা, তারপর নতুন নতুন ঔষধের প্রয়োগ, অতঃপর সারের পর সার দেওয়া, ডিজেল আর বিদ্যুতের ব্যবস্থা, তারপর পানির সেঁচের ব্যবস্থা করা, আরও কত কিছু? এত কষ্টের যা বের হয়ে আসে, তাতে দেখা যায়¬-সে ফসল পুষ্টিকর উপাদানশূন্য। লাভের চেয়ে ক্ষতিকর বেশি। আর তখন খোদ কৃষি বিজ্ঞানীই ঘোষণা দিয়ে দেয় যে, নব আবিষ্কৃত ঔষধ আর সার দিয়ে ফলানো ফসল মানুষের শরীরের জন্য ক্ষতিকর।

ফুলের দোকানগুলোতে ফুলের আকৃতিতে অনেক ফুল দেখা যায় ঠিকই; কিন্তু সেখানে সুঘ্রাণ বলে কিছু নেই। খাবারে পুষ্টিদ্রব্য নেই, আর যখন পুষ্টিদ্রব্যই নেই; তো সেটা রিযিক কিভাবে হবে? আর এজন্যই সর্বসাধারণের মহান হাকিম ঘোষণা দিলেন-

لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا অর্থাৎ আর মন্দ ভূমি থেকে অল্পস্বল্প ছাড়া কিছুই গজায় না। আল্লাহ তাআলা তাকে শস্যের মাঝে অন্তর্ভুক্তই করেননি। সেটাকে রদ্দি বা আগাছা হিসেবেই উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ তাআলা’র নাযিলকৃত শরীয়তকে না মেনে মানুষ যুগে যুগে ক্ষতি ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। ইহকালীন ও পরকালীন সব ধরনেরই ক্ষতি ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। শুধু ক্ষতি আর ক্ষতি, বিপর্যয় আর বিপর্যয়। এ বিপর্যয় তাদের জন্য, যাদের কাছে দুনিয়ার সবকিছু আছে এবং তাদের জন্যও যাদের কাছে কোনো কিছুই নেই।

আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন-

﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ﴾

"আর যে ব্যক্তি আমার স্মরণ থেকে ফিরে যাবে; তবে তার জন্য নিশ্চয়ই রয়েছে সংকুচিত জীবিকা নির্বাহের উপায়, আর কিয়ামত দিবসে আমি তাকে অন্ধ অবস্থায় পুনরুত্থিত করব ।"

আল্লাহর নাযিলকৃত শরীয়তের সাথে বিদ্রোহ করে নিজেদের জীবনকে উপভোগকারী শক্তিগুলোর কী পরিণতি হয়েছিল?- সেই ক্ষতিগ্রস্থতাই তো! ইহকাল ও পরকাল কোনোটিতেই তারা সার্থক হতে পারেনি। মুসলমানদেরকে গণহারে হত্যা করার জন্য এবং আফগানিস্তানের ভূমি থেকে আল্লাহর আইনকে রহিত করার জন্য বিশ্বকুফরী শক্তির সঙ্গ এজন্যই দিয়েছিল যে, এটা পার্থিব ভোগবিলাসে তাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে। এটা কত বড় প্রতারণাই না ছিল যে, আল্লাহর সাথে কুফরী করে, আল্লাহর শরীয়তের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং মুসলমানদের ওপর গণহত্যা পরিচালনা করার জন্য নিজেদের সৈন্য পাঠিয়ে আল্লাহর যে ক্রোধের তারা শিকার হবে, যার কারণে তাদের জিন্দেগী দুর্বিষহ হয়ে ওঠার কথা, উল্টো তারা আগের চেয়েও আরাম আয়েশে থাকার ইচ্ছে পোষণ করছে। কিন্তু, কে বিশ্বাস করবে? যাঁদের অন্তরে এ কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং যাঁরা আমেরিকার বিধানের বিপরীতে আল্লাহর বিধানকেই বেশি গুরুত্ব প্রদান করে তাঁরা ছাড়া?

ইতিহাস সাক্ষী যে, আল্লাহর শরীয়তের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পরিণামে উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে উপনীত ও ভোগ বিলাসিতায় মত্ত লোকদের বসতিগুলো আল্লাহ তাআলা এমনভাবে গুড়িয়ে

দিয়েছেন যে, আর কেউ সেখানে গিয়ে বসবাসের কল্পনাও করতে পারেনি। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন-

﴿ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۖ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴾

“আমি কত অসংখ্য জনপদ নির্মূল করে দিয়েছি, যার অধিবাসীদেরকে তাদের ভোগ বিলাসের উপকরণ মত্ত করে রেখেছিল। আর এ হচ্ছে, তাদের ঘরবাড়ি যেখানে তাদের পর অল্প জনগোষ্ঠী ব্যতীত কেউ বসবাস করত না। আর আমিই এর স্বত্বাধিকারী হলাম।”

সব ধরনের আরাম আয়েশে মত্ত জাতিগোষ্ঠী যখন আল্লাহর শরীয়ত পালনে অস্বীকৃতি জানাল, তখন আল্লাহ তাআলাও তাঁর নেয়ামতসমূহ থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করলেন।

বঞ্চিত আর বঞ্চিত। মধ্যপ্রাচ্যের ব্যাপারে তো বলার অপেক্ষা রাখে না। খোদ পশ্চিমাদের বঞ্চিতকরণের মাঝে শিক্ষা রয়েছে। যদিও দাজ্জালী মিডিয়া সেটা গোপন করতে চায়; কিন্তু বাস্তবতা গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন। রিযিকের নামে তারা যা খাচ্ছে, তাতে খাদ্য-পুষ্টি বলতে কিছুই নেই। তারা বিভিন্ন বাহারের ফল খায়; কিন্তু, তাতে কোনো স্বাদ বা তৃপ্ততা নেই। নিরেট বানানো বীজ থেকে বানানো খাদ্য। বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক বিষাক্ত সার দিয়ে তাদের জন্য গম-ভুট্টা তৈরি করা হয়। তাদের কোনো খালেস ও প্রাকৃতিক রিযিক জুটে না। এটাও এক ধরনের বঞ্চিতকরণ। আল্লাহ তাআলা যাকে চান তাকে তাঁর নেয়ামতসমূহ থেকে বঞ্চিত করেন। এভাবে যে, সব উপকরণ তাদের কাছে থাকা সত্ত্বেও তারা সেই খাদ্য থেকে বঞ্চিত।... কেন?

পৃথিবীতে এর উৎকৃষ্ট উপমা হিসাবে মিশর বিদ্যমান। নীল নদের উপকূলে অবস্থিত উর্বর ভূমি এক সময় বিশ্বের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ফসল উৎপাদন করত। কিন্তু, মিশরের নেতৃবর্গ ও প্রশাসন আল্লাহর শরীয়তের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করল। তারা চিন্তা করল, বর্তমানে রিযিক তো আল্লাহ দেন না, আমেরিকা ও ইসরাঈল দেয়। আর তাই মিশর বানর আর শূকরের বংশধরদের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আল্লাহর শরীয়তের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করল। পরিণামে, অতিরিক্ত রিযিক তো দূরের কথা, ভূগর্ভের যে খাযানা ও বরকত ছিল; আল্লাহ তাআলা তাও বন্ধ করে দিলেন। সেই নীল দরিয়া আজও বিদ্যমান, আর মিশরের ভূমিও অপরিবর্তিত; কিন্তু মিশরের বর্তমান কৃষিব্যবস্থার প্রতি একটু দৃষ্টি দিন এবং স্বীয় প্রভুর নিকট তাওবা আর ইস্তিগফার করুন এ মর্মে যে, নব আবিষ্কৃত টেকনোলোজির এ যুগেও রিযিকের কর্তৃত্ব মহামহিম আল্লাহর হাতেই সংরক্ষিত। বাকি কথা হলো, শয়তান আর তার অনুসারীরা যে অঙ্গীকার করে, তা মিথ্যা বৈ কিছু নয়।

উপমহাদেশের জনগণ কি এ বাস্তবতাকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছে না? যে ভূমি ইসলামী শাসনাধীনে থাকাকালীন স্বর্ণ উদগিরন করত; আজ কী হলো যে, সে ভূমির কৃষকেরা তাকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করে দিয়েছে? বিশ্বের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ফসল উৎপাদনকারী ভূমি অন্যের কাছে ফসলের জন্য হাত প্রসারিত করছে? কখনো চিনির হাহাকার, কখনো গমের জন্য চিৎকার, কখনোবা চাউলের সংকট আর কখনো অন্য কিছুর?

ভারত উপমহাদেশে ধন-সম্পদ আর ফসলাদির এত প্রাচুর্য ছিল যে, ইউরোপিয়ান ডাকাতরা তা লুট করে নিয়ে গেছে; আর সেখানে 'শিল্প বিপ্লব' সাধিত হয়েছে। মুসলমানদের সম্পদ লুটপাট করে ইংরেজ চোরেরা বিশ্বের নেতৃত্ব দিচ্ছে!

পুরো মুসলিম বিশ্বের অবস্থা এমনই। অথচ, আল্লাহ তাআলা সব ধরনের মাধ্যম তাদেরকে এজন্যই দিয়েছেন যে, এগুলোকে ব্যবহার করে তারা বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে। যে দায়িত্ব আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর আরোপ করেছেন, সেটা পালন করবে। কাফেরদের দাসত্ব করার পরিবর্তে তাদের কে দাস বানানোর মূলনীতি গ্রহণ করবে।

কিন্তু তারা যখন তাদের ওপর আল্লাহর শরীয়তের পরিবর্তে জাতিসংঘের শরীয়তকে ঊর্ধ্বে উত্তোলন করেছে, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের কাছে সবকিছু থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে আন্তর্জাতিক সুদখোরদের দয়া-অনুগ্রহের সামনে ছেড়ে দিয়েছেন। এখনো কি এ বাস্তবতা উপলব্ধি করার সময় আসেনি যে, সৌদি আরবের মতো এক রাষ্ট্র কেন সংকীর্ণ জীবনযাপনের শিকার এবং কুফরী শক্তিগুলোর মাশুলদাতা হয়ে আছে?

যে উম্মাহর কাছে দুনিয়ার উৎকৃষ্ট সব উর্বর ভূমি বিদ্যমান, যাদের কাছে মূল্যবান সমুদ্রবন্দর মওজুদ, সুয়েজ খাল থেকে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত সব ধরনের ভুগর্ভস্থ সম্পদ যাদের করতলগত। কিন্তু এসব কিছুর পরও কুফরীশক্তির সামনে পরাজিত এবং এতই নত যে, তারা বর্তমানে সুদি ঋণে স্বীয় জনগণকে এমনভাবে জড়িয়ে ফেলেছে, যার কারণে বংশের পর বংশ গোলামে পরিণত হয়েছে। এসব কিছু কেন?

খোদ পশ্চিমা বিশ্ব আল্লাহর শরীয়তের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে কেমন অবস্থানে আছে; যাদের শ্লোগান অন্যদের সচ্ছল বানাবে? আর এখন সব ধরনের আবর্জনা এবং জৈবিক উপকরণ ও ঢেকে রাখা ব্যাপারগুলো জিহাদী অপারেশনের সকল আবরণকে প্রকাশ করে দিয়েছে যে, এ মিথ্যা প্রবঞ্চনাগুলো কেমন সূক্ষ্ম ও প্রতারণাপূর্ণ ছিল?

এটা হলো, আল্লাহর শরীয়তের সাথে বিদ্রোহের শাস্তি। আর তাই, আল্লাহর ভূমিগুলো ক্রোধান্বিত হয়ে স্বীয় বরকত ও ধনগুলো আটকে রেখেছে। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি থাকা সত্ত্বেও কোনো শক্তি জমিন থেকে তার গুপ্তধন বের করিয়ে নিতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই ভূমির ওপর আল্লাহর নাযিলকৃত শরীয়ত পুনরায় বাস্তবায়িত হয়।

পবিত্র কুরআন বিভিন্ন জায়গায় সচ্ছল ও শক্তিশালী জাতিগোষ্ঠীর দৃষ্টান্ত পেশ করেছে, যারা আল্লাহর শরীয়তের সাথে শত্রুতা পোষণ করত; যাতে সাম্প্রতিককালের শত্রুরা এখনই শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে এবং “হয়তো শরীয়ত নয়তো শাহাদাত” এর সম্মানিত সেøাগানকে গ্রহণ করে নেয়।

আল্লাহ তাআলা সাবা গোত্রের উন্নতি ও সচ্ছলতার উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন-

﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ ﴾

“সাবার অধিবাসীদের জন্য তাদের বাসভূমিতে ছিল নিদর্শন; দু’টি উদ্যান, একটি ডান দিকে একটি বাম দিকে। তোমরা তোমাদের পালনকর্তার রিযিক খাও এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। (একদিকে) স্বাস্থ্যকর শহর এবং (অপরদিকে) ক্ষমাশীল পালনকর্তা।”

﴿ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَـٰهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَىْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَىْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴾

"অতঃপর, তারা অবাধ্যতা করল; ফলে, আমি তাদের ওপর প্রেরণ করলাম প্রবল বন্যা। আর তাদের উদ্যানদ্বয়কে পরিবর্তন করে দিলাম এমন দুই উদ্যানে; যাতে উদগত বিস্বাদ ফলমূল, ঝাউগাছ এবং সামান্য কূলবৃক্ষ।"

﴿ ذَٰلِكَ جَزَيْنَـٰهُم بِمَا كَفَرُوا ۖ وَهَلْ نُجَـٰزِىٓ إِلَّا ٱلْكَفُورَ ﴾

"এটা ছিল কুফরের কারণে তাদের প্রতি আমার শাস্তি। আমি অকৃতজ্ঞ ব্যতীত কাউকে শাস্তি দেই না।"

﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِى بَـٰرَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَـٰهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرَ ۖ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِىَ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ﴾

"তাদের এবং যেসব জনপদের লোকদের প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছিলাম, সেগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে অনেক দৃশ্যমান জনপদ স্থাপন করেছিলাম এবং সেগুলোতে ভ্রমণ নির্ধারিত করে দিয়েছিলাম। তোমরা এসব জনপদে রাতে ও দিনে নিরাপদে ভ্রমণ করো।"

আল্লাহর নাযিলকৃত জীবনব্যবস্থা ছেড়ে মানুষ ক্ষতিগ্রস্থতা থেকে বাঁচতে পারে না। (যে এমন করবে, তাকে) সব ধরনের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করা হবে। যে নেয়ামত তার কাছে অর্জিত ছিল; তাও ছিনিয়ে নেওয়া হবে।

আল্লাহ তাআলা ইয়াহুদীদের বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার কারণে কত নেয়ামত থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

﴿ فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَـٰتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ﴾

“বস্তুত, ইয়াহুদীদের জন্য তাদের পাপের কারণে আমি হারাম করে দিয়েছি বহু পূত-পবিত্র বস্তু; যা তাদের জন্য হালাল ছিল। আর এ কারণে যে, তারা আল্লাহর পথে অত্যধিক বাধা দিত।”

সূরা আনআমে আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন-

﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٍ ۖ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَآ أَوِ ٱلْحَوَايَآ أَوْ مَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۚ ذَٰلِكَ جَزَيْنَـٰهُم بِبَغْيِهِمْ ۖ وَإِنَّا لَصَـٰدِقُونَ ﴾

“ইয়াহুদীদের জন্য আমি হারাম করেছিলাম নখরবিশিষ্ট সকল জন্তু। গরু ও ছাগল থেকে তাদের জন্য হারাম করেছিলাম তাদের চর্বি; তবে যে চর্বি তাদের পিঠ বা অন্ত্রে লেগে থাকে বা যা কোনো অস্থিতে থাকে তা ছাড়া। তাদের অবাধ্যতার কারণে আমি তাদেরকে এ শাস্তি দিয়েছিলাম। আর আমি অবশ্যই সত্যবাদী।”

পাশ্চাত্যের অজ্ঞতাপূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন সংস্কৃতিকে জীবনব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণকারীদের জন্য এ আয়াতগুলোতে অনেক বড় শিক্ষা রয়েছে। কেননা, আল্লাহ তাআলা আজ তাদেরকে প্রাকৃতিক অনেক নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করেছেন। ইউরোপ আমেরিকার জীবন চরিত্রের দিকে যদি লক্ষ্য করা যায়; তাহলে বুঝা যাবে যে, তাদের ঔদ্ধত্য এবং আল্লাহর শরীয়তের সাথে যুদ্ধংদেহী মনোভাবের কারণে সব ধরনের নেয়ামত থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

টাটকা ফল-ফুল, খাঁটি দুধ, ঘি, মাখন এবং আরও অসংখ্য নেয়ামত থেকে আধুনিক অজ্ঞ সোসাইটি বঞ্চিত। এমনকি নিরেট গম আর খাঁটি পানীয় থেকেও। এভাবে যে, তারা আল্লাহ প্রদত্ত খাঁটি পানীয় পান করার পরিবর্তে বোতলে আবদ্ধ দুর্গন্ধযুক্ত পানীয় পান করে। খাঁটি গম ছেড়ে তারা ময়দা খায়, যেটা পাকস্থলীর উপযুক্ত খাদ্য নয়; বরং উল্টো পাকস্থলীকে খেয়ে ফেলে।

মোট কথা, যে যত বেশি এ সংস্কৃতি ও সভ্যতায় ডুব দিয়েছে, সে ততই আল্লাহর নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লিখিত আয়াতগুলোতে ইয়াহুদীদেরকে যেসব খাদ্য থেকে নিষেধ করা হয়েছে, সবগুলোই উৎকৃষ্ট, উন্নত, সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী ছিল।

সব ধরনের প্যানোরামা পাখি, একটু চিন্তা করুন। তিতির পাখি, ব্যাটর, কবুতর, কাজিন, মোরগ, ময়ূর, হরিণ, নীলাভ গাভি ইত্যাদি। এগুলো থেকে নিষেধ করে তাদেরকে উট, উটপাখি এবং গৃহপালিত হাঁস খাওয়ার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আপনারা চিকিৎসা বিজ্ঞানের বইগুলোতে স্বতন্ত্রভাবে খাদ্য থেকে সৃষ্ট অভ্যাসগুলোর ব্যাপারে জেনে নিতে পারেন।

গাভি এবং বকরির গোশত তাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। আর যে গোশত ও চর্বিকে তাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে, তা প্রাণীজগতে উৎকৃষ্ট কোনো খাদ্য হিসেবে গণ্য করা হয়

না। যেমন, নাভির সাথে সম্পৃক্ত চর্বি গলায় গিয়ে আটকে থাকে। এজন্য এর চর্বিগুলোকে পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যসম্মত মনে করা হয় না।

আল্লাহ তাআলার নেয়ামত থেকে বঞ্চিতকরণের কিছু চিত্র

আসমান ও জমিনের রব যখন কোনো জাতির ওপর রুষ্ট হোন, তখন তিনি যতটুকু ইচ্ছা তাদের থেকে তাঁর নেয়ামত ছিনিয়ে নেন। কখনো শরয়ীভাবে অর্থাৎ, দ্বীনি ক্ষেত্রে তাদের ওপর ঐ নেয়ামত হারাম করে দেন। কখনো সৃষ্টিগতভাবে যার বিভিন্ন কারণ হতে পারে। কখনো ঐ সকল লোকই সে সকল নেয়ামত নিজেদের ওপর হারাম করে নেয়। কেননা, তখন তাদের জ্ঞানশূন্য করে দেওয়া হয় এবং ঐ ব্যাপারে তাদের চোখে কোনো ধরনের জৈবিক ও প্রাকৃতিক ক্ষতি পরিলক্ষিত হয় না। আর এমনটি তাদের অপরাধের কারণেই করা হয়, যা তারা মহান রবের সাথে করেছে।

তাফসীরে 'আনওয়ারুল বয়ানে' আল্লামা আশেকে ইলাহী বুলন্দশহরী রহ. লিখেছেন-

﴿ ذَلِكَ جَزَيْنَـهُم بِبَغْيِهِمْ ۖ وَإِنَّا لَصادِقُونَ ﴾

অর্থাৎ, "তাদের অবাধ্যতার কারণে আমি তাদেরকে এ শাস্তি দিয়েছিলাম। আর আমি অবশ্যই সত্যবাদী।" এ ধরনের আয়াত সূরা নিসায়ও অতিবাহিত হয়েছে যে,

﴿ فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَـاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ﴾

"বস্তুত, ইয়াহুদীদের জন্য তাদের পাপের কারণে আমি হারাম করে দিয়েছি বহু পূত-পবিত্র বস্তু; যা তাদের জন্য হালাল ছিল।"

এ থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তাআলা'র সাথে অবাধ্যতায় লিপ্ত হওয়া এবং গুনাহ করে নিজেদের ওপর জুলুম করা পাক-পবিত্র জিনিসগুলো থেকে বঞ্চিত হওয়ার অন্যতম কারণ। ইয়াহুদীদের ওপর শরয়ীভাবে পবিত্র জিনিসগুলো হারাম করা হয়েছিল; কিন্তু সর্বশেষ নবী ﷺ এর ওপর নবুওয়াত সমাপ্ত হওয়ার কারণে কোনো জিনিস এখন শরয়ীভাবে হালাল থেকে হারাম হবে না। নছসমূহ রহিত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকার কারণে। তবে, সৃষ্টিগতভাবে ভালো জিনিসগুলো থেকে বঞ্চিতকরণ হতে পারে। যেটা বিভিন্ন সময় দৃশ্যমান হয় এবং এটা বিভিন্ন কারণে হতে পারে।

অনুরূপভাবে, ইমাম আবু মানসূর মা'তুরিদী রহ. সূরায়ে নিসার আয়াতের অধীনে লিখেছেন-

ثم المنع لهم يكون من جهتين

احدهما: منع من جهة منع الإنزال: لقلة الامطار والقحط، كسني يوسف - عليه السلام - وسني مكة علي ما كان لهم من القحط

والثاني: منع من جهة الخلق: الا يعطوا شيئا، لا بيعا ولا شراء ولا معروفا

অর্থাৎ, 'নেয়ামত থেকে বঞ্চিতকরণ দু'ভাবে হতে পারে। প্রথম প্রকার: অবতরণের দিক দিয়ে। আর তা হচ্ছে, অল্প অল্প বৃষ্টি বর্ষিত হওয়া এবং মহামারী প্রেরণ করা। যেমন, ইউসুফ আ. এর যুগের দুর্ভিক্ষের বছরগুলো এবং রাসূল ﷺ এর যুগে মক্কাবাসীর উপর দুর্ভিক্ষের বছরগুলো প্রণিধানযোগ্য।

দ্বিতীয় প্রকার: সৃষ্টির পক্ষ থেকেও এটা হতে পারে। এভাবে তারা বঞ্চিতদের কিছুই দেয় না। তাদের কাছে ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ করে দেয় এবং অনুগ্রহস্বরূপও কিছু দেয় না।’

অনুরূপ ইমাম আবু কাতাদাহ রহ. বলেন-

عوقب القوم بظلم ظلموه وبغي بغوه، حرمت عليهم أشياء ببغيهم وبظلمهم

‘কোনো জাতিকে তাদের জুলুম আর অবাধ্যতার কারণে শাস্তি দেওয়া হয়। তাদের ঔদ্ধত্য এবং অবাধ্যতার কারণে বিভিন্ন পবিত্র জিনিসসমূহ তাদের ওপর হারাম করা হয়েছে।’

ইমাম ইবনে কাসির রহ. বলেন-

عن ابن خيرة- وكان من اصحاب علي، رضي الله عنه- قال: جزاء المعصية الوهن في العبادة، والضيق في المعيشة، والتعسر في اللذة. قيل: ومالتعسر في اللذة؟ قال: لا يصادف لذة حلالا الا جاءه من ينغصه اياه

ইবনুল খিয়ারহ, যিনি হযরত আলী রাযি. এর সাথীদের মধ্য হতে একজন। তিনি বলেন, ‘অবাধ্যতা ও নাফরমানির শাস্তি হলো, ইবাদতে অলসতা এসে যাওয়া, জীবিকার মধ্যে সংকীর্ণতা এবং স্বাদে তিক্ততা আসা। অর্থাৎ কোথাও যদি স্বাদ অনুভব করে, তখন সাথে সাথে এমন এক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যে, সে স্বাদ তার জন্য আরও দুর্বিষহ হয়ে ওঠে।’

عن ثوبان قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلّم : ان العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ولا يرد القدر الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر

হযরত ছাওবান রাযি. থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, "মানুষকে তার গুনাহর কারণেই রিযিক থেকে বঞ্চিত করা হয়। একমাত্র দুআই তাকদীরকে পরিবর্তন করতে পারে। আর ভালো ও সৎকাজ মানুষের হায়াত বৃদ্ধি করে।"

আর বিশ্বের অধিপতি ঘোষণা করেন-

﴿ ذَٰلِكَ جَزَيْنَـٰهُم بِبَغْيِهِمْ ۖ وَإِنَّا لَصَـٰدِقُونَ ﴾

"তাদের অবাধ্যতার কারণে আমি তাদেরকে এ শাস্তি দিয়েছিলাম। আর আমি অবশ্যই সত্যবাদী।"

মানবতা ধ্বংসের দায়ভার কার ঘাড়ে?

এর দায়ভার ঐ শ্রেণীর ওপর যারা বৈশ্বিক পুঁজিবাদের দোহাই দিয়ে গণতান্ত্রিক ও অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পরিচালনা করছে এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে এ কুফরী ও অত্যাচারী ব্যবস্থার দাস বানিয়েছে। বৈশ্বিক ব্যাংকার, অসংখ্য জাতীয় কোম্পানি, ইবলিসকে নিজেদের প্রভু হিসেবে স্বীকৃতিদানকারী, প্রভাবশালী কিছু আত্মপূজারি- আত্মপূজাই যাদের দ্বীন, এরা এমন কিছু লোকের বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং তাদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে; যারা পুরো মানবতাকে সুদ ও পুঁজিবাদের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে এবং আল্লাহর শরীয়তের বিপরীতে গণতন্ত্রের মাধ্যমে নিজেদের বানানো আইনকে মানুষের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। বৈশ্বিক এ কুফরী ব্যবস্থার সংরক্ষণের জন্য জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন দেশগুলোতে স্থানীয় ব্যাংকারদের থেকে ঋণের মাধ্যমে কয়েক শ্রেণীর সৈন্যবাহিনী গঠন

করেছে, যাদের উপরস্থ শ্রেণী এসব দেশগুলোতে প্রতিষ্ঠিত সুদি ব্যবস্থাগুলোর সংরক্ষণে নিয়োজিত রয়েছে। সেটা যে দেশই হোক না কেন, শাসনব্যবস্থা যার হাতেই যাক না কেন এ সুদিব্যবস্থা চালু থাকবে।

এ বাস্তবতাকে কেউই অস্বীকার করতে পারবে না। ইউরোপ-আমেরিকার ওপর আধিপত্য বিস্তারকারী শক্তিগুলো নিজেদের জনগণের সাথে সে আচরণ করেছে, যা ফিরআউন তার জাতির সাথে করেছিল।

﴿ فَٱسْتَخَفَّ قَوْمَهُۥ فَأَطَاعُوهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَوْمًا فَـٰسِقِينَ ﴾

"অতঃপর, সে তার সম্প্রদায়কে বোকা বানিয়ে দিল, ফলে তারা তার কথা মেনে নিল। নিশ্চয়ই, তারা ছিল পাপাচারী সম্প্রদায়।"

সুতরাং ইউরোপের এ প্রভাবশালী শক্তিগুলো তাদের জাতিকে 'জনগণের শাসন' নামক শ্লোগানে তাদেরকে খেল-তামাশার সেই ষাঁড় বানিয়েছে যে, ইউরোপের পুনঃজাগরণ, ফ্রান্স ও আমেরিকার বিপ্লবের আজ শতবর্ষ অতিক্রান্ত হলো; এখনো জনগণ খেলার সেই ষাঁড়ই রয়ে গেল। তারা তাদের আখিরাত তো অনেক আগেই বরবাদ করে দিয়েছে, দুনিয়াতেও এ জনগণরা বিশ্বের সুদখোরদের মজুরি করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনি।

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন-

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا۟ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ـ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ۖ وَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ﴾

“আপনি কি তাদেরকে দেখেন নি? যারা আল্লাহর নেয়ামতকে কুফরে পরিণত করেছে, এবং স্বজাতিকে সম্মুখীন করেছে ধ্বংসালয়ে জাহান্নামে; তারা তাতে প্রবেশ করবে। আর তা অতি মন্দ আবাস।”

পশ্চিমা বিশ্বে নিজেদের দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার পর সুদখোরেরা মুসলিম বিশ্বে নিজেদের ছল-চাতুরী শুরু করেছে। উসমানী খিলাফতকে ধ্বংস করেছে। উম্মাতে মুসলিমাহকে খিলাফতের বন্ধন থেকে বের করে অভিশপ্ত জাতীয়তাবাদে বিভক্ত করেছে এবং তাদের ওপর নিজেদের দালাল একনিষ্ঠ দাস শাসকবর্গ ও জেনারেলদের বসিয়ে দিয়েছে, যারা নিজেরাই মুহাম্মাদ ﷺ এর আনীত শরীয়তের দুশমন।

যারা প্রকাশ্যে মুসলমানদের ন্যায় নাম ধারণ করেছে; কিন্তু তাদের অন্তর কাফেরদের চিরসঙ্গী। তারা নিজ দেশ ও জাতির সাথে গাদ্দারি করল আর কাফেরদের একান্ত আস্থাভাজনে পরিণত হলো। মুহাম্মাদ ﷺ এর আনীত শরীয়ত থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করল আর কাফেরদের দ্বীনকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করল। এটা এমন একশ্রেণী যারা স্বীয় জনগণকে দারিদ্রসীমার নিচে রেখে নিজেদের ও বৈশ্বিক পুঁজিবাদের উদরগুলো পূর্ণ করে। নিজেদের সন্তানদের ভবিষ্যতকে উজ্জ্বল করার জন্য স্বজাতির লোকদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন করে।

মানবতার মুক্তি: স্রষ্টার সৃষ্টির মাঝে একমাত্র স্রষ্টার বিধান বাস্তবায়নে

মানবতার মুক্তি ফিরিয়ে আনার পথ একটিই। সেটা ঐ পথ, যার ওপর চলে মানবতা সর্বদা সফল হয়েছিল। এটা এমন পথ যে, যদি দিকভ্রান্ত ও বিপদগ্রস্ত জাতিগুলো এর ওপর চলে; তাহলে বিশ্বের প্রধান ও পথপ্রদর্শকে পরিণত হবে। আরব-আজম, পূর্ব-পশ্চিমের রাজা বাদশাদের বাদশাহী তাদের ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট হবে। দুনিয়ার বড় বড় পরাশক্তিগুলো তাদের পদচুম্বন করবে।

যে পথ অনুসরণ করে মানুষ তার স্রষ্টা পর্যন্ত পৌঁছেছে। নিজেকেও পৌঁছিয়েছে, এবং জিন্দেগীর মূল উদ্দেশ্যকেও পৌঁছিয়েছে। মানবসমাজ চরিত্রের সর্বোচ্চ অলঙ্কারে সজ্জিত হয়েছে।

যেখানে নিরাপত্তা ও স্থিরতা, ইজ্জত-সম্মান, লজ্জা-শরম, অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতিপূরণ, আত্মত্যাগ ও প্রাধান্যতা, এবং আত্মীয়-স্বজনের পবিত্র সম্পর্ক সবকিছুই অর্জিত হয়েছিল।

মানব ইতিহাস সাক্ষী যে, এসব গুনাবলি মানুষের জন্য অর্জিত হয়েছিল কেবল একটিমাত্র পথেই, আর তা হলো- আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাবকে বিধান ও জীবনব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করে নেওয়া। রহমাতুল্লিল আলামীন তথা বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ মুহাম্মাদ ﷺ এর আনীত শরীয়তকে জীবনাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে দেশসমূহে তা বাস্তবায়ন করা।

পৃথিবী এবং তার মধ্যে অবস্থিত যা কিছু আছে সবগুলোকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর একমাত্র পথ হলো, এ পৃথিবীকে আল্লাহর নাযিলকৃত ব্যবস্থা অনুযায়ী শাসন করা। কেননা, আল্লাহ তাআলা'র সত্তা হলো, সারা পৃথিবীকে লালনকারী সত্তা। তিনিই মানবজাতিকে সঠিক পথে চালানোর জন্য তাঁর রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন। সবশেষে, মুহাম্মাদ ﷺ কে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ পাঠিয়েছেন। যে শরীয়ত দিয়ে মুহাম্মাদ ﷺ কে পাঠানো হয়েছে, তা কেবল মুসলমানদের জন্য নয়; বরং পুরো বিশ্বের জন্য রহমতস্বরূপ।

মানুষের ভালো-মন্দের ব্যাপারে মহান আল্লাহ থেকে কে বেশি অবগত আছে? যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাকে মায়ের পেটে তিনটি আবরণের মাঝে জীবন দান করেছেন এবং দুর্বলতা থেকে শক্তিমান করেছেন। সুতরাং, তিনি যে জীবনব্যবস্থা (দ্বীন) মুহাম্মাদ ﷺ কে দিয়ে প্রেরণ করেছেন, তা শুধু মুসলিমদের জন্য নয়; বরং কাফেরদের জন্য এমনকি ভূপৃষ্ঠের প্রত্যেক অনু-পরমাণু, জড়পদার্থ, জীবজন্তু এবং উদ্ভিদের জন্যও রহমতস্বরূপ।

সুতরাং যখন আল্লাহ তাআলা'র প্রকৃতিগত আইনের সাথে বিদ্রোহ করা হবে এবং তাঁর নাযিলকৃত জীবনব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান করে শাসকগোষ্ঠীর বানানো ব্যবস্থাকে জীবনব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করা হবে, তখন তার পরিণামস্বরূপ ব্যাপকভাবে ধ্বংস ও বড় বিপর্যয়ের দৃশ্য বিশ্বকে প্রত্যক্ষ করতে হবে।

মানবজাতিকে পরিপূর্ণ ধ্বংসের হাত থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত রক্ষা করা যাবে না, যতক্ষণ না আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধানকে বিজয়ী করা হবে। যেটাকে আল্লাহ তাআলা জীবনব্যবস্থা হিসেবে মানুষের জন্য পছন্দ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন-

﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ﴾

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন (জীবনব্যবস্থা) হিসেবে পছন্দ করলাম।"

মানবতাকে বিপর্যয় থেকে মুক্তি দেওয়া কার দায়িত্ব?

মানবতাকে এ বিশাল ট্র্যাজেডি ও বিপর্যয় থেকে সেই মুক্তি দিতে পারে, যে ঐ দাওয়াতের পতাকাবাহী, যে দাওয়াত রহমাতুল্লিল আলামীন ﷺ নিয়ে এসেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর যাঁরা এ দাওয়াতের আমানতদার।

সূরায়ে আসরের এ আয়াত إِنَّ ٱلْإِنسَـٰنَ لَفِى خُسْرٍ ঈমানদারদেরকে দীপ্ত স্বরে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, হে ঐ জাতি! যাদেরকে এক মহান ব্রত দিয়ে দুনিয়াতে প্রেরণ করা হয়েছে। যাদেরকে কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে। যাদেরকে দুনিয়ার অসত্যের অন্ধকার জীবনব্যবস্থা থেকে বের করে মুহাম্মাদ ﷺ এর আনীত আলোকিত ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। যাদের এজন্যই শ্রেষ্ঠ উম্মাহ বানানো হয়েছে যে, তারা মানবজাতিকে শিরক, মূর্তিপূজা এবং বিভিন্ন উপাসকদের ইবাদত থেকে বের করে শরীকবিহীন এক আল্লাহর ইবাদতে প্রবেশ করাবে। তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের ক্ষতিগ্রস্থতা থেকে 'ফাওযে মুবিন' তথা স্পষ্ট ও প্রকাশ্য সফলতার রাস্তায় নিয়ে আসবে। যদিও তাদের মুক্তির জন্য তোমাদের প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়, নিজেদের জিন্দেগীকে যুদ্ধের

ভয়াবহ ময়দানে নিক্ষেপ করতে হয়, রৌদ্রের খরতাপে চমকিত তলোয়ারের ছায়াতলে থাকতে হয়, নিজেদের স্ত্রীদেরকে ‘বিধবা’ আর সন্তানের কপালে ‘ইয়াতিম’ নামের অপ্রিয় স্পট বসানো হয়, তারপরও তোমরা তাদের জন্য কিতাল করবে। মানবজাতির হিদায়াত, কামিয়াবী ও সফলতার জন্য তোমাদের অন্তরগুলোতে এমন জযবা ও ছটফটানি থাকবে যে, তোমরা এর জন্য জান কুরবান করতেও কোনো কুণ্ঠাবোধ করবে না। আর তখনই হতে পারো তুমি শ্রেষ্ঠ উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত। যখন নিজের সত্তা, স্থিরতা এবং অস্তিত্ব অন্যদের কল্যাণ ও সফলতার জন্য কুরবানকারী হয়ে যাবে, তখন তুমি হবে خير الناس للناس তথা মানুষের মাঝে শ্রেষ্ঠ সে ব্যক্তি যে মানুষের উপকার করে, এর বাস্তব প্রতিচ্ছবি। এমনকি তুমি তাদেরকে শিকল পরিয়ে পর্যন্ত নিয়ে আসবে, আর তা-ই তার জন্য চির সফলতার সোপান হয়ে দাঁড়াবে।

আয়াতের এ অংশ উপমহাদেশের দাঈদের আহবান করছে যে, হে মূর্তির আবাসস্থলে তাওহীদের চিরন্তন শিখাকে প্রজ্বলিতকারীগণ! এ আধুনিক যুগেও তোমাদের সাথে এমন একজাতি বসবাস করছে, যারা আজও পাথরের পূজায় মত্ত। স্বহস্তে তৈরি করার পর বাজারে বিক্রিত পাথরের মূর্তিকে ক্রয় করে নিজেদের মা’বূদ হিসেবে গ্রহণ করছে। তাদেরকে মূর্তি পূজার অন্ধকার থেকে বের করে তাওহীদের আলোকোজ্জ্বল পথে নিয়ে আসার দায়িত্ব কাদের? তাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং হিদায়াতের পথে নিয়ে আসার জন্য তোমাদেরকেই ফিকির করতে হবে। দাওয়াতের পথে প্রতিবন্ধক আইম্মাতুল কুফরকে হটানো তোমাদেরই দায়িত্ব; যাতে অন্য লোকদের জন্য হিদায়াতের রাস্তা খুলে যায়, এবং তাদের (আইম্মাতুল কুফর) বিরুদ্ধে তোমাদের জিহাদ তাদের জন্য রহমতের কারণ হয়।

আপনারা কি দেখেন না যে, মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণরা কোটি কোটি আল্লাহর বান্দাকে আল্লাহর ইবাদত থেকে ফিরিয়ে মূর্তির উপাসনায় লিপ্ত রেখেছে?

ঈমানদারদেরকে জাগ্রত করার জন্য এবং তাদের ফরয ও অবশ্যপালনীয় কর্তব্যকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য কি এ আয়াত যথেষ্ট নয়? উম্মাহর চিন্তাবিদশ্রেণী সাম্প্রতিককালে মনুষ্যত্বের করুণ অবস্থা সম্পর্কে অবগত নন কি?

প্রথম দিকে এ অবস্থা ইউরোপে সীমাবদ্ধ ছিল। আর বর্তমানে তো খোদাদ্রোহিতার এ অভিশপ্ত প্লাবন নিজেদের ঘরের কোনায় কোনায় পৌঁছে গিয়েছে। এখনো কি আমরা গাফলতির অঘোর ঘুমে দুঃস্বপ্ন দেখতে থাকব? আরাম-আয়েশের অনুসন্ধানে, স্বীয় সত্তাকে বাঁচানোর জন্য ইসলামের চিরশান্তির গ-ি থেকে ফিরে গিয়ে কুফর ও শিরকে পরিপূর্ণ নোংরা মতবাদকে গ্রহণ করে নেব?

পবিত্র কুরআনের ছোট সূরার ছোট আয়াতকে একটু অন্তরের কান লাগিয়ে শুনুন! মানবতার ব্যথায় ব্যথিতদেরকে আমলের এ দাওয়াত দিচ্ছে-

﴿ وَالْعَصْرِ - إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾

সময়ের শপথ! এ আধুনিক যুগেও মানুষের ধ্বংসের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে।... ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে; বরং ক্রমান্বয়ে একটির পর অপর একটি দল ধ্বংসে পতিত হচ্ছে। তোমাদের তো তাদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যই পাঠানো হয়েছিল। হে মাসজিদ আবাদকারীগণ! শুনে রাখুন, (إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ) তথা এ আধুনিক

যুগেও মানুষের ধ্বংসের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। হে মিম্বার ও মিহরাবের উত্তরাধিকারীগণ! চার দেয়ালের বাহিরে নজর বুলিয়ে দেখুন! (إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَفِى خُسۡرٍ) তথা এ আধুনিক যুগেও মানুষের ধ্বংসের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। আপনাদেরকে তো নবীদের আ. উত্তরাধিকারী হিসেবে পাঠানো হয়েছিল। ঐ দ্বীনের পতাকাবাহী বানানো হয়েছিল, যেটি মানবজাতির জন্য একমাত্র মনোনীত জীবনব্যবস্থা। ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত এ লোকদের সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব আপনাদের কাঁধে অর্পিত হয়েছে।

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন-

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾

“তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত। মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা আল্লাহর ওপর ঈমান আনবে।”

ইমাম বুখারী রহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-

عن ابي هريرة رضي الله عنه ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ قال صلي الله عليه وسلم: خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتي يدخلوا في الإسلام

হযরত আবু হুরাইরাহ রাযি. বর্ণনা করেন, (তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত। মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে।) এর ব্যাখ্যায় রাসূল ﷺ বলেন, “তোমরা মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম। তোমরা তাদের গর্দানে শিকল পরিয়ে নিয়ে আস, (তাদেরকে তোমাদের মাঝে বন্দী অবস্থায় রেখে দাও) যতক্ষণ না তারা ইসলামে প্রবেশ করে।”

আল্লামা আলূসী রহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন-

عن ابن عبّاس في الآية: أن المعني تأمرونهم أن يشهدوا أن لا اله الا الله ويقرّوا بما أنزل الله تعالي وتقاتلونهم عليهم ولا اله الا الله هو أعظم المعروف وتنهونهم عن المنكر والمنكر هو التكذيب وهو أنكر المنكر

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এ আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বলেন, 'তোমরা মানুষদের এ আদেশ দাও যে, তারা যেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ্য প্রদান করে এবং যা কিছু আল্লাহ তাআলা তাঁর হাবীব ﷺ এর ওপর অবতীর্ণ করেছেন, তার স্বীকৃতি প্রদান করে। তোমরা এর জন্যই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হও। আর সবচেয়ে বড় মারূফ তথা মঙ্গলজনক ও কল্যাণকর বস্তু হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তোমরা তাদেরকে মুনকার তথা অসৎ ও অকল্যাণকর বস্তু থেকে বারণ করো। আর সবচেয়ে বড় মুনকার হলো আল্লাহ কে অস্বীকার করা।'

অর্থাৎ তোমরা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা প্রদানের ভিত্তি ও সূত্রের ওপরই কুফফারদের বিরুদ্ধে লড়াই কর। এখানে আমর বিল মা'রূফের সবচেয়ে উঁচুস্তর অর্থাৎ ইসলামের দিকে দাওয়াত এবং যে শরীয়ত মুহাম্মাদ ﷺ এর ওপর নাযিল করা হয়েছে, তার স্বীকৃতি আদায় করানো। নাহি আনিল মুনকার অর্থাৎ নিকৃষ্ট মানের মুনকার কুফর থেকে তোমরা বাধা দাও। ইমাম আবুল লাইস সমরকন্দী রহ. এমনই তাফসীর করেছেন।

অতঃপর তোমরা তাদের ওপর বিজয় লাভ কর এবং তাদেরকে যুদ্ধবন্দী করে নিয়ে আস। আর এ বন্দিত্বই তাদের জন্য রহমত হয়ে যায় এবং তোমাদের সাথে থেকে খুব কাছ থেকে

ইসলামের সৌন্দর্য্য অবলোকন করে। ফলস্বরূপ, তারা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানের কামিয়াবী তাদের অর্জিত হয়।

সুতরাং আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকারের সর্বোচ্চ চূড়া অর্থাৎ জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'র কারণেই এ উম্মাহ শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে। এটিই মানবজাতির সৌভাগ্য ও সফলতার প্রতীক। প্রাণীজগৎ, জীবজগৎ ও উদ্ভিদজগৎ এমনকি পুরো মহাবিশ্ব সুকৃঙ্খলভাবে টিকে থাকার একমাত্র মাধ্যম। এটা (الأرض) তথা মহাবিশ্বকে ফাসাদ থেকে পবিত্র করে তার মূল প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত রাখার উপায়।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন কথাটি এভাবে বলেছে-

﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴾

"আল্লাহ যদি একজনকে অপরজনের দ্বারা প্রতিহত না করতেন; তাহলে গোটা দুনিয়া বিধ্বস্ত হয়ে যেত। কিন্তু বিশ্ববাসীর প্রতি আল্লাহ একান্তই দয়ালু, করুণাময়।"

অতএব, আল্লাহ তাআলা পুরো বিশ্বের ওপর এভাবে দয়া ও করুণা প্রদর্শন করেছেন যে, বিশ্বের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরিত রাসূল ﷺ কে কিতাল ও জিহাদের বিধান দিয়েছেন; যাতে সেসব পরাশক্তিকে প্রতিহত করা যায়; যে শক্তিগুলো রহমতের এ জীবনব্যবস্থাকে বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। যেন তাদেরকে ধূলিসাৎ করে পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর নেযাম ও জীবনব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা যায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

﴿ وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ ٱنتَهَوْا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

"আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো, যতক্ষণ না ফিতনা নির্মূল হয়; এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তারপর, তারা যদি বিরত হয়ে যায়; তবে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ সম্যক দেখছেন।"

কেননা, আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নাযিলকৃত শরীয়ত পবিত্র এবং অনৈসলামী সকল ব্যবস্থা অপবিত্র। অতএব, পবিত্র ও অপবিত্র এক জায়গায় একত্রিত হতে পারে না। এজন্য ইসলাম ব্যতীত অন্য সব ব্যবস্থা উৎখাতের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য:

জিহাদের মাধ্যমে ইসলাম প্রথমত এটা চায় যে, কাফেররা যেন কালেমা পড়ে পরিপূর্ণ ইসলামে প্রবেশ করে এবং মুহাম্মাদ ﷺ কর্তৃক আনীত জীবনব্যবস্থাকে দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। কিন্তু যদি তারা এ কালেমা পড়তে রাজি না হয়; তবে যেন জিযিয়া বা ট্যাক্স দেওয়ার অঙ্গীকার করে। তাহলে তাকে কালেমা পড়ার ওপর বাধ্য করা হবে না; বরং তার থেকে ট্যাক্স গ্রহণ করা হবে (যদি সে কালো তালিকাভুক্ত না হয় অর্থাৎ যাদের থেকে ট্যাক্স নেওয়া জায়েয, শুধুমাত্র তারাই এর আওতাভুক্ত)। জিযিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো, এরা তাদের পুরাতন ধর্মে বহাল থাকবে; কিন্তু তার রাষ্ট্রে মুহাম্মাদ ﷺ এর শরীয়ত বাস্তবায়িত থাকবে এবং এরা জিযিয়া দিতে থাকবে। আর এর প্রতিদানস্বরূপ ইসলামী রাষ্ট্র তাদের জান-

মালের সংরক্ষণ করবে। কিন্তু তারা যদি জিযিয়া দিতেও প্রস্তুত না হয়, তখন তাদের সাথে যুদ্ধ করা হবে। যতক্ষণ না তারা পূর্বোক্ত দু'টির কোনো একটি বেছে নেয়।

এখানে চিন্তার বিষয় হলো, আল্লাহ তাআলা কাফেরদেরকে তাদের কুফরের ওপর বহাল থাকার অনুমতি প্রদান করেছেন। (যদিও মূলত, এটি কুফরের ওপর বহাল থাকার অনুমতি নয়; বরং আল্লাহ তাআলা ভালো করেই জানেন যে, ইসলামী জীবনব্যবস্থাকে নিকট থেকে প্রত্যক্ষ করার পর এরা মুসলিম হয়ে যাবে। আসলে তাদেরকে ইসলামের দিকে নিয়ে আসার জন্য এটি একটি দূরদর্শী পরিকল্পনা।) যেহেতু তারা জিযিয়া দিয়ে নিজেদের রাষ্ট্রে শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রস্তুত হয়, এটাই প্রমাণ করে যে, তারা তাদের দেশগুলোতে শরীয়ত বাস্তবায়নের মোটেই বিরোধিতা করছে না।

এ আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল যে, ইসলাম চায় কাফেরদের ওপরও মুহাম্মাদ ﷺ এর শরীয়ত আইন হিসেবে নেতৃত্ব ও সর্দারি করবে। কেননা, ইসলাম বিজয়ী ও সর্বোচ্চে থাকার জন্যই এসেছে। ইসলামকে বিজয়ী করার মাধ্যমেই মুনকার তথা অসত্যকে প্রত্যেক স্তর থেকে বাধা দেওয়া যাবে। ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা ও ওয়াজ-নসীহতের মাধ্যমে এবং যে তা না মানবে, তাকে শরীয়তের ক্ষমতা বলে বাধা প্রদান করা হবে। ঐসব ছিদ্রগুলো বন্ধ করে দেওয়া হবে, যেখান থেকে গর্হিত কার্যাদি প্রকাশ পায়। অতঃপর, সমাজ সংস্কার ও পরিশোধনের জন্য ওয়াজ-নসীহত, দাওয়াত ও তাবলীগ এবং দারস-তাদরীসের আশ্রয় নেওয়া হবে। তখন মানুষ তার আসল স্বভাবের দিকে ফিরতে শুরু করবে এবং তার স্বভাব ফাসাদ থেকে পবিত্র হয়ে আল্লাহর রঙে রঙিন হতে শুরু করবে।

এ কারণেই মহান আল্লাহ তাআলা গর্হিত কর্মসমূহের মূলোৎপাটনে শক্তি প্রয়োগের অনুমতি প্রদান করেছেন। নাপাকি ও নোংরামিতে পূর্ণ পৃথিবীকে পবিত্র ও পরিষ্কার করার জন্য জিহাদকে ফরয করেছেন; যাতে এর মাধ্যমে কুফরের কর্তৃত্ব নস্যাৎ করে ইসলামের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়। কেননা, মানবসমাজকে অসৎ ও মন্দ কাজ থেকে রক্ষা করার জন্য জরুরি হলো, ঐসব মাধ্যমকে উৎখাত করা; যা এসব মন্দ কাজগুলো প্রসারিত হওয়ার জন্য দায়ী। ঐ ব্যবস্থা ও অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো, যেটা স্বয়ং এ মন্দ কাজগুলোর উৎসগিরি। যার প্রতি প্রান্তে অশ্লীলতা ও মন্দের দিকে এমনভাবে আহবান করা হয় যে, একজন ভালো ও সৎ লোককেও সেদিকে প্রবল আকর্ষণে টেনে নিয়ে যায়। এ বাস্তবতা উপলব্ধি করা কোনো বুদ্ধিমানের জন্য মোটেও কঠিন নয় যে, যদি কোনো পরিবেশে কোনো গর্হিত কাজ ব্যাপকতা লাভ করে যেমন, আমাদের এ যুগে সুদ ব্যাপকভাবে চলমান মন্দ কাজ। যেটা রাষ্ট্রযন্ত্র কর্তৃক মুসলমানদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, তারা যে কোনোভাবে সুদ আদায় করে ছাড়বে। সুতরাং এমন পরিবেশে কোনো ব্যক্তি অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজেকে কীভাবে এর ভয়াল থাবা থেকে বাঁচাতে পারে? অনুরূপভাবে গানবাদ্য ও মিউজিকের একই অবস্থা।

সমাজে বিদ্যমান প্রতিষ্ঠিত এ পরিবেশ পুরো সমাজব্যবস্থাকে তাড়াতাড়ি হোক অথবা দেরিতে স্বীয় রঙে রঙিন করে ফেলবে। যদি সব জায়গায় মৌখিক দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে সংশোধন করা সম্ভব হতো; তাহলে আল্লাহ তাআলা তার মনোনীত আম্বিয়া আ. -গণকে পাপাচারে পূর্ণ পরিবেশ থেকে হিজরত ও জিহাদের নির্দেশ প্রদান করতেন না।

আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রেরিত শরীয়ত বাস্তবায়নের গুরুত্ব এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, যেখানে আল্লাহ তাআলা স্বীয় হাবীব ﷺ কে দ্বীন দিয়ে পাঠানোর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন-

﴿ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴾

“তিনিই তাঁর রাসূল ﷺ কে পথনির্দেশ ও সত্যধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন; যাতে তিনি একে সকল ধর্মের ওপর প্রবল করে দেন; যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।”

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসলাম আসলী কাফের তথা পূর্ব থেকে অবিশ্বাসী লোককে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করে না; কিন্তু তার ওপর শরীয়তের বিধান মানা আবশ্যক করে। ‘মালাউল কওম’ তথা ঐ সকল প্রভাব বিস্তারকারী শ্রেণীর গর্দান উড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করে, যারা মানবসমাজে সীমালঙ্ঘন ও অত্যাচার, অশ্লীলতা ও বেলেল্লাপনা, বদদ্বীনি ও অনৈতিকতার পরিবেশ টিকিয়ে রাখতে চায়।

শরীয়ত বাস্তবায়ন করার জন্য এ যুদ্ধের নির্দেশ তো ঐ সকল কাফেরদের বেলায়, যারা এখনো ইসলামও গ্রহণ করেনি। সুতরাং ঐ সকল শাসকদের ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কী হতে পারে আপনি চিন্তা করুন, যারা নিজেদেরকে মুসলমান হিসেবে পেশ করে, মুখে কালেমা পাঠ করে; কিন্তু মহান আল্লাহর নাযিলকৃত শরীয়তের প্রকাশ্য শত্রু। তা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টাকে শক্তি প্রয়োগ করে প্রতিহত করে; বরং তা তালাশকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এতটুকুতেই ক্ষান্ত নয়, এ যুদ্ধকে বরং বৈধ মনে করে, সেটাকে তারা জিহাদ মনে করে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে হত্যাযজ্ঞ চালানো, তাদের ভিটেমাটিকে ধ্বংস করার জন্য

কাফেরদের সহায়তা করা, তাদেরকে নিজেদের ভূমি, সৈন্যবাহিনী ও নিজেদের সামরিক বন্দরসমূহ প্রদান করা, তাদের পার্লামেন্টের নিয়মানুযায়ী বৈধ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

যাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা কুফরের সূতিকাগার। যেখানে আল্লাহর সাথে একটি কুফর করা হয় না; বরং অসংখ্য অগণিত কুফর করা হয়। যাদের আদালতের মূল চালিকাশক্তি সেই কুরআন নয়, যাকে দিয়ে মুহাম্মাদ ﷺ কে পাঠানো হয়েছে; বরং, সেটি যাকে গণতন্ত্রের মূর্তিগুলো গ্রহণ করে নেয়। যাদের সমাজব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার রূহ ও স্তম্ভ অভিশপ্ত সুদের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যাকে তাদের সংসদীয় কমিটি হালাল তথা বৈধ সাব্যস্ত করেছে। আর এ পার্লামেন্টই মুহাম্মাদ ﷺ এর আনীত শরীয়ত বাস্তবায়নের পথে বড় প্রতিবন্ধক।

আধুনিক এ যুগ কামনা করে যে, মানবসমাজকে যেন কুফর ও শিরকের অন্ধকার থেকে বের করে ইসলামের আলোয় জোতির্ময় করে দেওয়া হয়। অজ্ঞতা ও অরাজকতার ব্যবস্থাপনার মূলোৎপাটন ঘটিয়ে মহান আল্লাহর নাযিলকৃত ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা হয়। বিশ্বের কর্তৃত্ব শয়তানের গোষ্ঠী থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আল্লাহর কিতাবধারীদের হাতে সোপর্দ করা হয়। এ অত্যাচারী সুদি ব্যবস্থা এবং দ্বীন ও দেশের এসব বিশ্বাসঘাতক থেকে কেবল মুসলমান নয়; বরং কাফেরদেরকেও যেন বড় ধরনের বিপর্যয় থেকে মুক্তি দিয়ে চিরশান্তির নীড়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এটা প্রত্যেক মুসলমানের কাছে কুরআনের কামনা, সময়ের দাবি এবং এ দ্বীনের চাহিদা।

আল্লাহর মহত্ব ও বড়ত্ব অন্তরে লালন করে, সৎকর্ম দিয়ে নিজের ভূমিকা ঢেলে সাজিয়ে, কুরআনের প্রত্যেক আয়াতের পরিপূর্ণ দাওয়াত নিয়ে জেগে ওঠা; অতঃপর, এরই প্রচার-

প্রসার করা ও অটল থাকার জন্য বিশ্ব পুনরায় আপনার জন্য অপেক্ষমাণ। মানবতা আজ এমন কোনো নাবিকের পথপানে চেয়ে আছে।

سبق پھر پڑھ صداقت کا، امانت کا، دیانت کا

لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا

"সত্যবাদিতা, আমনতদারিতা ও নেতৃত্বের অনুশীলন কর পুনরায়

নেওয়া হবে তোমার থেকে বিশ্ব নেতৃত্বের মহান কাজ।"

পৃথিবীর সকল ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়েছে। সকল রাষ্ট্রব্যবস্থা ও জীবনব্যবস্থার ওপর আচ্ছাদিত প্রতারণার আবরণ ছিটকে পড়েছে। এগুলো কৃত্রিম ষড়যন্ত্র এবং ধূর্ততা ও প্রতারণা ব্যতীত কিছু নয়।

অতএব তাওহীদী উম্মাহর পক্ষেই সম্ভব, বাতিল ও অসত্যের ভয়াল থাবায় বিপর্যস্ত মনুষ্যত্বের নিমজ্জমান এ নৌকাকে উদ্ধার করা। জুলুম ও নৈরাজ্যের এ সুদি ব্যবস্থার আগ্রাসনে বিপর্যস্ত ও অশান্ত এ দুনিয়ায় নিরাপত্তা ও ন্যায়পরায়ণতাদানকারী ব্যবস্থায়ই শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারে। কেননা, তোমরা ছাড়া অন্য কেউ সে ব্যবস্থার পতাকাবাহী নয়, যা মহান আল্লাহ কর্তৃক অবতারিত। যে ব্যবস্থা রহমতে পূর্ণ, পদাধিকারের কারণে সৃষ্ট বিভেদ, ভাষাগত ও জাতিগত বৈষম্য থেকে পবিত্র। যেটা মানুষকে বাহ্যিক চাকচিক্যের ওপর বিচার করে না; বরং, তাকওয়াই হলো যেখানে শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি।

এটা বাস্তব যে, মনুষ্যত্বকে বিশ্বের হিংস্র জানোয়াররা গোগ্রাসে নিয়ে নিয়েছে। তারা কোনোভাবেই তা হাতছাড়া করতে চাইবে না। তাদের চোয়ালগুলোতে মানবতার রক্ত লেপ্টে আছে। আর এজন্যই প্রত্যেক ঐ মুসলিমের সাথে তারা যুদ্ধ ঘোষণা করে রেখেছে, যে তাদের এ হিংস্রতার বিরুদ্ধে হুংকার ছুঁড়েছে। যাঁরা তাদের বিধানকে চ্যালেঞ্জ করেছে। যাঁরা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান বাস্তবায়নের দাওয়াত দেয়, যে বিধান মনুষ্যত্বকে দুনিয়া ও আখিরাতের ক্ষতিগ্রস্ততা থেকে মুক্তি দেবে।

আন্তর্জাতিক ব্যাংকার, বৈশ্বিক সুদখোর এবং মানবজাতিকে শয়তানের দাসে পরিণতকারীরা কিভাবে এটা সহ্য করবে যে, কেউ এসে মানবজাতিকে তাদের করবে? এজন্যই তো পৃথিবীব্যাপী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ডামাডোল পিটানো হয়েছে। এই শয়তানী মিশন বাস্তবায়ন করার জন্যই বিভিন্ন নতুন নতুন সামরিক জোট, কিছু প্রকাশ্যে কিছু গোপনে গঠন করা হয়েছে। শেষ অবধি তারা পরাজয়ের সম্মুখীন এ যুদ্ধে জয়ের স্বপ্ন দেখছে।

অতএব, এ পথে কিছু কষ্ট তো হবেই। কিছু বিপদ তো আসবেই। কিন্তু যদি সম্মুখপানে বড় মাকসাদ থাকে যে, মানুষকে মানুষ বানানো, তাকে তার রব পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া, তাকে পরাশক্তিগুলোর বন্দেগি থেকে মহান আল্লাহর বন্দেগির দিকে নিয়ে যাওয়া, আল্লাহর সত্তার ওপর পূর্ণ ঈমান আনানো, সৎকর্ম দ্বারা স্বীয় উদ্দেশ্যের ব্যাপারে মজবুত করা এবং 'পরস্পরকে হক্ব ও সবরের উপদেশ দান' এর মানহায।

এখানে যদি জান যায় তারপরও সে বিজয়ী। যদি মুসীবতের স্বীকার হতে হয়- জেল, অন্ধকার কুঠরি, ফাঁসির দড়ি; তাহলে যুগের শপথ! সেই তো خير الناس للناس এর বাস্তব প্রতিচ্ছবি,

মানুষের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত, সবচেয়ে নিষ্ঠাবান ও ওয়াফাদার, যে শুধুমাত্র নিজের সহোদর, সগোত্র ও দেশের জন্য যুদ্ধ করে না; বরং এজন্য যুদ্ধ করে- যে সেøাগানে অনুপ্রাণিত হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন রাসূল ﷺ এর সাহাবায়ে কেরাম।

لنخرج العباد من عبادة العباد إلي عبادة رب العباد

অর্থাৎ, 'আমরা যুদ্ধ করি, মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে বের করে মানুষকে মানুষের প্রতিপালকের দাসত্বে নিয়ে যাওয়ার জন্য।' আজ সাহাবায়ে কেরামের রাযি. উত্তরাধিকারীগণ এই মহান মিশনের কারণেই পৃথিবীব্যাপী তাগুতদের চক্ষুশূলে পরিণত হয়েছে। এর জন্যই কষ্ট-ক্লেশ স্বীকার করছে, হিজরত করছে এবং দিগি¦দিক ছোটাছুটি করছে। শুধুমাত্র এ চিন্তায় যে, যেন এ উম্মাহ পরিপূর্ণ কিতাবুল্লাহ'র অনুসরণ করে পরিপূর্ণ সফলতা লাভ করে। এরা কুফফারদের সাথে যুদ্ধ জিহাদ করে, তাদেরকে জাহান্নামে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করছে; অথচ আইম্মাতুল কুফর তথা কুফফারদের লিডাররা তাঁদের হত্যা করছে। তাঁদের ওপর বৃষ্টির মতো বোমা ফেলছে। তাঁদের সাথে বিশ্বযুদ্ধ শুরু করেছে। কিন্তু তাঁরা কত সম্মানিত, কত দরদি, কত সহমর্মী, মানুষের জন্য কত উপকারী বন্ধু যে, তাঁরা শুধু এ ফিকির করছে- কীভাবে মানুষ ক্ষতিগ্রস্থতা থেকে রক্ষা পাবে। তাঁরা চায় কুফফাররা ইসলামে প্রবেশ করে চিরক্ষতিগ্রস্থতা থেকে মুক্তি পাক। এঁরা তাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান করে, এবং কুফর থেকে বাধা প্রদান করে। তাঁরা নিজেদের জানবাজি রেখে কুফফারদেরকে চিরস্থায়ী জাহান্নামের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ দিয়ে চিরস্থায়ী জান্নাতের নেয়ামতসমূহের দিকে নিয়ে আসে।

এমন পাগলদের ব্যাপারেই ঘোষণা করা হয়েছে-

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾

“তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত। মানবজাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা আল্লাহর ওপর ঈমান আনবে।”

আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকারের সর্বোচ্চ চূড়া অর্থাৎ, যদি কিতালও করতে হয়; তাহলে তাঁরা কিতালও করে। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, “তোমরা এর ওপর কিতালও করবে।”

এগুলোই সফল ব্যক্তিদের পরিচিতি। এরাই আল্লাহর সৃষ্টির ওপর দয়াপরবশ, যাঁরা কাফেরদেরকে হিদায়াতের দিকে নিয়ে আসার জন্য নিজেদের জানের নযরানা পেশ করে। এঁরা আল্লাহর মাখলুককে ফাসাদ ও বিপর্যয় থেকে রক্ষা করে আসল প্রকৃতি ও স্বভাবের ওপর ফিরিয়ে আনার জন্য নিজেদের সত্তাকে বিলীন করে দেয়। মরু থেকে মরু, জনপদ থেকে জনপদ, পাহাড় ও উপত্যকা, জল-স্থল ও অন্তরীক্ষ সব জায়গা তাঁদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। এ পাগলরাই ধড় ও জানের বাজি লাগিয়ে অত্যাচার ও সীমালঙ্ঘনের এ ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছে।

কেননা, যখনই মুসলমানদের থেকে এ জযবা হারিয়ে গেছে, তখনই বিশ্বে শরীয়তের কর্তৃত্ব সরে এসেছে। অতঃপর, উসমানী খিলাফাহকে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। তখন থেকে মুসলিম বিশ্বে অন্ধকারের কালো মেঘ এমনভাবে ঘনীভূত হয়েছে যে, কোনো আলোকিত ভোরই

বলতে পারবে, কে আপন এবং কে পর? কে দোস্ত কে দুশমন? কে হত্যাকারী, কে ইনসাফগার? কে ডাকাত আর কে পথপ্রদর্শক?

কিন্তু সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর যখন চৌদ্দশত হিজরীর (বিংশ শতাব্দী) সূর্য অস্তমিত হয়েছে এবং পনেরোশত শতাব্দীর সূর্য উদিত হয়েছে, তখন মহান আল্লাহ খোরাসানের পবিত্র ভূমি থেকে আফগান জাতিকে নিজেদের দ্বীনের প্রতিরক্ষার জন্য, তা মজবুত করার জন্য এবং আল্লাহর জমিনে তাঁর কিতাবের বিধান বাস্তবায়ন করার জন্য মনোনীত করেছেন। আর সম্ভ্রান্ত জাতির ঈর্ষান্বিত পবিত্র ভূমিকে ইসলামী আন্দোলনগুলোর জন্য এক শক্ত ঘাঁটি বানিয়েছেন।

উসমানী খিলাফত ধ্বংসের পর এটাই প্রথম দৃশ্য ছিল যে, মুসলমানরা দলবদ্ধভাবে কোনো এক জায়গায় জিহাদের জন্য একত্রিত হয়েছেন এবং দেখতে দেখতে ত্যাগ ও কুরবানির এমন আলোকোজ্জ্বল ইতিহাস রচনা করেছেন, যেটা ইতিহাসের গতিপথ পাল্টে দিয়েছে। আফগান জাতি যেভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে কুরবানি পেশ করেছে, তা ইসলামের ইতিহাসে এমন এক সুবর্ণ সুযোগ যে, দক্ষ কলমবাজদের ওপর তা ঋণস্বরূপ; যা বিশ্বের সামনে তুলে ধরা তাদের ওপর আবশ্যক। বহু কাহিনী- কান্দাহার ও হেলমান্দের কাহিনী, প্রতিভাবান যুবক, সাদা দাড়িওয়ালা বুযুর্গ এবং অল্প বয়স্ক মুজাহিদদের বীরত্বের কাহিনী, সম্ভ্রান্ত মা, আত্মমর্যাদাশীল বোন, ছেলেদের এমন কুরবানি; যা বর্তমানে পশতুদের সামাজিক রীতিতে পরিণত হয়েছে।

এ বাস্তবতাকে কোনো দ্বীনদার ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারবে না যে, আফগান ভূমিতে পতিত শহীদের রক্ত দেশ ও জাতীয়তাবাদের আদর্শে বিভক্ত মুসলমানদের অন্তরে মুহাম্মাদ ﷺ এর

উম্মাহর অংশ হওয়ার অনুভূতি জাগরিত করে দিয়েছে। এটা ঐ জাতির ত্যাগের সুফল; যারা শত বিভক্ত, হয়রান এবং মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে পরাজিত উম্মাহকে সমস্যা সমাধানের পথ স্পষ্ট করে দিয়েছেন। সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মরীচিকায় সঠিক পথ তালাশকারী জাতিকে সঠিক সিরাতে মুস্তাকিমের পথের দিশা দিয়েছেন। উম্মাতে মুসলিমাকে জিহাদের দিকে আহবান করেছেন। তাদেরকে দুর্বলতা সত্ত্বেও শক্তিশালী শত্রুর মোকাবেলা করার সাহস যুগিয়েছেন। মহান আল্লাহর সেই সুন্নাহকে বুঝিয়েছেন যে, আল্লাহ তাআলা দুর্বলদের মাধ্যমে পরাশক্তিগুলোকে পরাজয়ের স্বাদ আস্বাদন করান। আল্লাহর কুরআনকে মাসজিদ-মাদরাসার সাথে সাথে অফিস-আদালত এবং সমাজে বাস্তবায়ন করেছেন। অতঃপর, অন্য আরেক বিশ্ব প্রভুর দাবিদার আমেরিকাকে তাদের মূলকেন্দ্রে ৯/১১ এর বরকতময় অপারেশনের মাধ্যমে লাঞ্ছিত করেছেন এবং এরপর তার ইজ্জত ও সকল প্রতিপত্তিকে আফগানিস্তানের পাহাড়-পর্বত, মরুভূমি ও উপত্যকাগুলোতে দাফন করার সুব্যবস্থা করলেন।

আল্লাহর কালেমাকে সর্বোচ্চে তুলে ধরার জন্য হক্ব পথে চলে নিজেদের জিন্দেগীকে ঢেলে সাজানো ব্যক্তিদের ইতিহাস তো এমন আলোকোজ্জ্বলই হবে যে, তাদের শ্বাস প্রশ্বাসের কারণেই এ অন্ধকারাচ্ছন্ন দুনিয়াতে আলো অবশিষ্ট থাকবে। এরা প্রত্যেক যুগেই নিজের কলিজার তাজা রক্ত দিয়ে এমন সময়ে চেরাগ জ্বালিয়েছে, যে সময় তুফানের সামনে দাঁড়ানোর সাহস করতে পারে না। এক চেরাগ থেকে অন্য চেরাগ জ্বলতে থাকে। আসমান সাক্ষী যে, শত ঝড়-তুফান এবং অন্ধকারের কালো মেঘ থাকা সত্ত্বেও এ চেরাগগুলোর আলো প্রত্যেক যুগে অন্ধকারের মাঝেও দেদীপ্যমান ছিল এবং পথভোলা লোকদের পথের সন্ধান

দিত। এমন খোদাপ্রেমিকদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে কাফেলা প্রত্যাশিত গন্তব্যে পৌঁছে যেত। আল-হামদুলিল্লাহ এখনো কাফেলা গন্তব্য পানে এগিয়ে চলছে।

এরা বাস্তব প্রতিচ্ছবি রহমাতুল্লিল আলামীন ﷺ এর এই ফরমানের-

لا تزال طائفة من امتي يقاتلون علي الحق ظاهرين علي من نأوأهم حتي يقاتل اخرهم المسيح الدّجّال

"আমার উম্মতের একটি দল কিয়ামত অবধি হক্কের জন্য যুদ্ধরত থাকবে। যারা এঁদের বিরোধিতা করবে এঁরা তাদের ওপর বিজয়ী থাকবে। এ পর্যন্ত যে, তাঁদের শেষ ব্যক্তি দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করবে।"

অন্য রেওয়ায়েতে এই শব্দগুলো এসেছে, لا يبالون من خالفهم "তাঁরা তাঁদের বিরোধীদের পরোয়া করবে না।"

আসুন! এদের সাথে যোগ দিয়ে মানবতাকে চরম ক্ষতি থেকে রক্ষা করুন! মুসলমানদের দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা অর্জনের উসিলা হোন। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের জন্য, এ খোদাপ্রেমিকদের সঙ্গ দিন। যে কোনোভাবেই হোক, জান দিয়ে অথবা মাল দিয়ে অথবা ভাষা দিয়ে এমনি দুআর মাধ্যমে হলেও এ আল্লাহওয়ালাদের সঙ্গ দিন।

কেননা, অতিক্রান্ত প্রত্যেক নিঃশ্বাসের সাথে সময়ও হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে। সঞ্চিত বস্তু হাত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। অতিক্রান্ত প্রত্যেক মুহূর্ত হয়তো কল্যাণের পথে অথবা অকল্যাণের পথে। অতঃপর, সেই দিন নিকট থেকে নিকটে চলে আসছে, যেই দিন কল্যাণ ও

অকল্যাণের রেজাল্ট প্রকাশ করা হবে। ঘোষণা করা হবে, কার ব্যবসা লাভজনক, কার সঞ্চয় কল্যাণ বয়ে এনেছে আর কারটা তাকে ক্ষতির নিম্নস্তরে নিক্ষেপ করেছে?

আল্লাহ তাআলা সকল মুসলমানকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করে সফলকাম ব্যক্তিদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করুন এবং উম্মাহকে ইজ্জত ও মহত্ব দান করুন।

وصلي الله تعالي علي خير خلقه محمد وعلي آله وأصحابه أجمعين

****